সুদূরের পিয়াসী

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

বি, এন, ঘোষ
কলিকাতা—৩১

নবপরিকল্পিত

সংস্করণ

১৩৪১

পি, ঘোষ কর্ত্তৃক বি, এন, ঘোষ, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীরমেশ
বসু কর্ত্তৃক মেটকাফ প্রেস ৬, রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রীচরণে—

এই লেখকের লেখা—

বাঁকা স্রোত

জটিলতা

সর্ব্বংসহা

ছায়াসঙ্গিনী

প্রহরী

বাঁশীওলা

মহানদী

অহল্যার স্বর্গ

পরপূর্ব্বা

মন বিনিময়

দিগন্তের ডাক

আলোক তীর্থ (যন্ত্রস্থ)

উত্তর বাহিনী (,,)

সুদূরের পিয়াসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মা, প্রতিবেশী বামুনমাসী ও বৌদিদিকে নিয়ে বন্ধু রওনা হবে তীর্থ-দর্শনে। পূর্ব্বোক্ত দু'জনে বৃদ্ধা, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স, কেবল বৌদিদি অল্পবয়সী, তরুণী। সঙ্গী হিসেবে এঁরা কেউই সুবিধার নন; তার ওপর মায়ের শরীর কিছু ভারী, বাতের ব্যামো আছে; আর মাসীমার দেহ বয়সের তুলনায় মজবুত হ'লে কি হবে, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। এ তীর্থ হ'লো বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে—কে জানে সেখানকার জল-হাওয়া কেমন, ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যায় কিনা!

একলা যেতে তাই বন্ধুর কেমন-কেমন বোধ হ'তে লাগল। যদিও তীর্থ-যাত্রী হিসেবে তার সুনাম আছে যথেষ্ট—বহুবার বহু দুর্গম তীর্থে সে গিয়েছে, বৃদ্ধা, যুবতী ও শিশুদের নিয়ে, এবং অক্ষত দেহে ও সুস্থ শরীরে আবার তাদের ফিরিয়ে এনেছে; তবুও এবার কিন্তু তারও সাহস হ'লো না। ফলে আমার ডাক পড়লো।

তাই হঠাৎ সেদিন ভোর বেলা বন্ধু এসে বললে, আমরা আজ চন্দ্রনাথ যাচ্ছি—তুইও চল আমাদের সঙ্গে।

চন্দ্রনাথ! জায়গাটার নাম শুনে মন ছাঁৎ ক'রে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে বল্লুম, যাবো।

মনে পড়লো, দশ বছর আগে আমার বাবা গিয়েছিলেন সেইখানে এবং সেই হয়েছিল তাঁর শেষ তীর্থ দর্শন! তাই, যে-তীর্থের সঙ্গে

তাঁর শেষস্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাকে একবার চাক্ষুষ দেখবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তখন আমি অনেকদিন বেকার বসেছিলুম খুড়োর গলগ্রহ হয়ে।

বলাবাহুল্য সংসারে আমার বিশেষ কোন বন্ধন ছিল না। মা শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন। তাছাড়া যারা স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, মানুষের মনে একটা অধিকার বিস্তার করে—যাদের ছেড়ে যেতে গেলে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, পা চলতে গিয়েও অন্য-মনস্কভাবে একবার থেমে যায়—তারা কেউই ছিল না। তাই সেদিন এক কথাতেই বেরিয়ে পড়লুম বন্ধুর সঙ্গে।

প্রভাতের কাঁচা রোদে গাছপালা ঝলমলিয়ে উঠলো; তারা যেন হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে আমাদের বিদায় দিলে। দূরের গ্রামগুলি—ছোট ছোট চালাঘর, সবুজ ক্ষেত, বাঁশের ঝাড়, শামলা কলমি ঢাকা পুকুর, বাঁশের পুল, সব যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল।

লৌহে লৌহ ঘর্ষণ ক'রে, উন্মত্ত কোলাহলে নিস্তব্ধ দুপুরকে বিদীর্ণ ক'রে, শান্ত গ্রামগুলি সচকিত করতে করতে আমাদের রেলগাড়ী ছুটে চললো।

লাইনের দু'ধারে একঘেয়ে দৃশ্য! যেন চোখের ওপর কে দুটো সবুজ লাইন টেনে চলেছে।

থার্ড ক্লাসের যাত্রী আমরা, তায় মেলার অসহ্য ভীড়! বাপরে, প্রাণ যায়! আর পারি না। মন ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে! দেহ ব্যথায় টনটন করতে থাকে! বার বার কেবল ঘড়ি দেখি।

সুদূরের পিয়াসী

দুপুর নাগাত গাড়ী গিয়ে থামল গোয়ালন্দ ষ্টেশনে। আমরা নামলুম সেখানে। মোটে এইটুকু পথ এসেছি, এতক্ষণে দেড়শো মাইল? আর একি ষ্টেশন! না আছে কোন ঘর, না আছে কোন পাকা প্ল্যাট্‌ফর্ম—শুধু এলোজমির ওপর দু'একটা দরমা-ঘেরা কুটুরী।

যাই হোক্। সেখান থেকে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আমরা ষ্টিমারে গিয়ে উঠলুম।

এত বড় ষ্টিমার আমি এর আগে কখনো দেখিনি। কত লোক, যেন মেলা বসেছে সেখানে। ওপরে নীচে যেদিকে চাই, শুধু যাত্রী, অসংখ্য যাত্রী, নানা দেশ থেকে তারা এসেছে—কেউ আট ঘণ্টা আগে, কেউ তার আগের দিন রাত্রে, কেউবা দুদিনের পথ হেঁটে এসে বসে আছে শুনলুম। তাই যে যেখানে পেয়েছে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ জায়গা ক'রে নিয়েছে। পথে জায়গা নেই, সিঁড়িতে জায়গা নেই, বারান্দায় জায়গা নেই। অথচ আমরা পাঁচটী প্রাণী, যাই কোথায়? এদিকে এই ষ্টিমার ফেল করলে আবার কাল এই সময় ছাড়া ষ্টিমার নেই। আমাদের সঙ্গে বিছানা, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি মালও অনেকগুলি!

নিরুপায় হয়ে শেষে কুলিকে মোটা বকশিসের লোভ দেখালুম। তখন সে ঠেলে-ঠুলে লোকের জিনিসপত্র মাড়িয়ে সরিয়ে আমাদের ওপরে নিয়ে গেল এবং বাবুর্চিখানার পাশে একটু জায়গা করে দিলে। কোন রকমে বিছানা বিছিয়ে ঠেসাঠেসি করে আমরা পাঁচজনে গিয়ে সেখানে বসে পড়লুম।

জামার বোতাম খুলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি—এমন সময় বন্ধুর মা 'ম্যাগো' বলে তাড়াতাড়ি বিছানার একটা কোণ সরিয়ে নিলেন।

চেয়ে দেখলুম, আমাদের বিছানার সঙ্গে বিছানা লাগিয়ে শুয়ে

আছেন লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। এসব দিকে মায়ের চোখ ভারী সাফ্!

উঃ, কোথায় নিয়ে এলি! বলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি নাকে কাপড় চাপা দিলেন।

বাবুর্চিখানার বিজাতীয় গন্ধে তখন চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত সকাল অনাহারের পর সে গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করতেই রসনা সরস হ'য়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে বাঁশী বাজিয়ে ষ্টীমার ছেড়ে দিল।

মধ্যাহ্নের প্রখর রোদে ঢেউগুলি ঝলমল করতে লাগল! দেখতে দেখতে আমাদের ষ্টিমার অনেক দূরে গিয়ে পড়লো। আমরা একবারে এসে পড়লুম মাঝ দরিয়ায়! জল—শুধু জল চারিদিকে—নীল স্বচ্ছ জল, অগণিত ঢেউ তুলে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কেবল দূরে—অতি দূরে দু'একটা গাছের মাথা, আর চালাঘর গ্রামের আভাষ দেয়। তারা যেন সলজ্জ বধূর মত ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরেই আবার অবগুণ্ঠনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

তারপর কোথায় গেল মাটী! কোথায় মিলিয়ে গেল তার শ্যামশ্রী! আর দেখতে পাই না, মনটা যেন কেমন একরকম হয়ে যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে মন লাফিয়ে ওঠে, আরে, ওইতো—ডাঙ্গা!

হঠাৎ দেখা যায় একটা চর কুমীরের মত জলের মাঝে পিঠ ভাসিয়ে যেন রোদ পোয়াচ্ছে। তার ওপর ছোট ছোট চালাঘর, গাছপালা, জেলেদের জাল, দু'একটা ছোট ডিঙ্গি—ঠিক যেন ছবির মত মনে হয়।

ষ্টিমার চলেছে।

সুদূরের পিয়াসী

সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়লো। আমরা এসে পড়লুম একেবারে পদ্মার বুকে! দেখলুম আকাশের সঙ্গে জলের মিলন! মনে হ'লো যেন অনন্তের সঙ্গে অনন্তের প্রেমালিঙ্গন! সে কি মহান দৃশ্য, সে কি অদ্ভুত শোভা! চোখ জুড়িয়ে গেল, মন ভরে উঠলো!

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম সে যেন দু'চোখ দিয়ে শুষে নিচ্ছে সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী। বৌদির মুখের দিকে তাকালুম, সেখানেও একটা স্বপ্নের ছবি!

মাসীমা তখন পান সাজছেন আর মার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর একটু 'জোরজোর' কথা বলা অভ্যাস এবং বলবার সময় তিনি কণ্ঠস্বর, হাত, মুখ, চোখ প্রভৃতির ভঙ্গিমা এমনভাবে করেন যেন মনে হয় তাঁর অভিনয় দেখছি।

মাসীমা তখন তাঁর পাশের বাড়ীর মেয়েটির কথা বলছিলেন—ছুঁড়ি এমন ঢলানি যে, পুরুষ দেখেছে কি অমনি ঢলে পড়বে তার গায়ে।

বন্ধু তাঁদের ডেকে বললেন, দেখ দেখ চেয়ে দেখ, কি সুন্দর দৃশ্য! চলনা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই!

মাসীমা গলায় একটা অদ্ভুত রকমের সুর টেনে এনে বললেন, না বাব্‌বা মরছি কোমরের ব্যথায়, কে আবার উঠে দাঁড়াবে?

মায়ের অবস্থাও সেইরকম। তিনি তখন পাদু'টা ছড়িয়ে দিয়ে দিব্যি গা ঢেলে দিয়েছেন বিছানায়। কাজেই তাঁরা কেউই উঠলেন না, আবার নিজেদের আলোচনায় মগ্ন হলেন।

আমি, বন্ধু ও বৌদিদি—তিনজনে উঠে এসে দাঁড়ালুম ফার্ষ্ট ক্লাশের বারান্দায়। কারো মুখে কোন কথা নেই—আমরা যেন ডুবে গেছি কোন সৌন্দর্য্যের অন্তরে, রূপের অতল গহ্বরে। একটা সীমাহীন

সুদূরের পিয়াসী

নীল শূন্যতার মধ্যে দিয়ে আমরা ভেসে চলেছি পথহারা পাখীর মত। কোথাও কোন অবকাশ নেই—আকাশে আর জলে সব একাকার হয়ে গেছে। এই সেই পদ্মা! রূপসী পদ্মা! সর্ব্বনাশী পদ্মা! মন বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে গেল!

আমাদের চোখের সামনে আকাশকে শেষ চুম্বন ক'রে সূর্য্য অস্ত গেল, বুঝি তাই লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে উঠলো। সন্ধ্যা এলো আকাশে তারার ফুল ছড়িয়ে, সমস্ত প্রকৃতিকে ঘুম পাড়িয়ে, তাদের কালো আঁচলের আবরণে ঢেকে রেখে। আমাদের চোখের সামনে একটা মসীময় যবনিকা এসে পড়লো দুর্ভেদ্য ও নিশ্ছিদ্র!

কোথায় চলেছি আমরা? দিক্‌চিহ্নবিহীন অন্ধকারের রাজত্বে, অথবা চিরস্থির কোন অন্ধ অন্তঃপুরে? ষ্টিমার ভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। সে কান্না কেউ শুনলে না। শুধু অন্ধকারের বুকে গুম্‌রে গুম্‌রে মিলিয়ে গেল—সুদূর কোন স্তব্ধতায়।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টিমার এসে থামলো চাঁদপুর ঘাটে। আরোহীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। এখান থেকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে চেপে তবে যেতে হয় চন্দ্রনাথ-ধামে।

আবার ট্রেন, আবার ভীড়, আবার নরনারীর অসহ্য কোলাহল শুনতে শুনতে অন্ধকারের পর অন্ধকার চিরে আমাদের গাড়ী ছুটতে লাগল।

ভোর হতেই গাড়ী এসে থামলো সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে! যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো 'জয় বাবা চন্দ্রনাথ'! মা ও মাসীমা কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন!

ভারী সুন্দর জায়গা! একদিকে উঁচু পাহাড় আর একদিকে সমতল

ভূমি, তাতে গাছপালা, বাগান, পুষ্করিণী, অসংখ্য ছোট ছোট চালাঘর। বেশীর ভাগ মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল, কোন-কোনটা আবার মাটির দোতালায় টিনের চাল। পাকা বাড়ী নেই বললেই হয়। কেবল ষ্টেশনের সামনে রাস্তার ধারে একখানা ছোট একতালা ঘর ছাড়া আমাদের চোখে আর ইঁটের বাড়ী পড়ল না। শহর থেকে এসে এ দৃশ্য ভারী চমৎকার লাগল!

কিন্তু এ কোথায় এলুম? এ যে জনসমুদ্র! যতদূর দেখা যায় কেবল অগণিত নরনারীর মাথা। মন হাঁপিয়ে উঠলো। তারপর আবার অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত—যেমন তাদের বেশভূষা, তেমনি চেহারা, আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাদের ভাষা! আমরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারি না। চাটগেঁয়ে অদ্ভুত বুলি!

এখন যাই কোথায়? শুনলুম একটা বাড়ীতেও আর লোক নেবার জায়গা নেই। দু'ঘণ্টা ধরে সমস্ত গ্রামটা ঘুরে এলুম কোথাও একটা ঘর খালি পেলুম না।

শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দ্রনাথের মেলা এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শোনা গেল এবার তিনলক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়েছে। কথাটা খুব সত্যি! দেখলুম ষ্টেশনের ধারে, রাস্তার দুপাশে, বাড়ীর আনাচে কানাচে তিল ধারণের স্থান নেই। একটা ক'রে উন্থন জ্বেলে সবাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে আর তারি পাশে পুঁটলি রেখে কাপড় বিছিয়ে যে যার বসে আছে। ভাতের মাড়ে, কাঠ কুটোয়, এঁটো পাতায় এবং বিষ্ঠায় সমস্ত জায়গাটা যেন নরক হয়ে উঠেছে।

বন্ধুর মাকে নিয়ে মুস্কিল! তিনি অতিরিক্ত পরিমাণে আচারপরায়ণা। তাই কোন রকমে নাকে কাপড় দিয়ে, স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমাদের

পিছনে চলতে লাগলেন। মাসীমাও কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, শুদ্ধাচারিণী বিধবা। কিন্তু তিনি তীর্থস্থান বলে সব দোষ ভুলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। ভারী সংস্কারমুক্ত তাঁর মন!

কোথাও কোন আশ্রয় না পেয়ে শেষে একজন পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু বেশী টাকা বকশিস্ দিতে রাজী হলুম। তিনি তখন নিজের শোবার তক্তপোষটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সেই ঘরের মাটিতে আশ্রয় নিলেন। এই ভাবে আমাদের একটা আশ্রয় মিললো।

চওড়া দেওয়াল দেওয়া মাটীর ঘর—বাইরে সরু একফালি ঘেরা-রক যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতসেঁতে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্নান ও জলযোগ করবার পর মাসীমা রাঁধবার জিনিষপত্র নিয়ে সেখানে গেলেন। আলো থেকে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রথমটা কিছু চোখে দেখা যায় না, তাই একটু পরেই তিনি চমকে উঠলেন। ওরি মধ্যে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছেন একজোড়া সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী! আশ্চর্য্য, এত অল্প বয়সের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী সচরাচর দেখা যায় না! তাই আমরা সবাই কৌতূহল বশত উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁদের একবার দেখে নিলুম।

সন্ন্যাসীর বয়েস একটু বেশী—ছিপছিপে, রোগা রোগা হাত পা, গালভর্ত্তি দাড়ি, মাথায় মেয়েদের মত চুল ঢিপি করা, চোখে মুখে যৌবনের দীপ্তি। আর সন্ন্যাসিনী—সে যেন মেঘে ঢাকা মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্য! তার আলোক নেই বটে কিন্তু উত্তাপ আছে। বয়েস ঠাওর করা শক্ত। পনেরোও হতে পারে আবার পঁচিশও হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

দুপুরের মধ্যেই মাসীমা তাদের সঙ্গে এমন আলাপ জমিয়ে নিলেন সে তাদের জীবনের ইতিহাস আমাদের কারুর জানতে বাকী রইল

না। তাদের নাকি বিয়ে হয়েছিল অতি শৈশবে, তারপর অপর পাঁচজনের মত পরস্পর পরস্পরকে ভালও বেসেছিল এবং সংসারধর্ম্মও যথারীতি করেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক মহাপুরুষের বাণী শুনে সংসারের ওপর বৈরাগ্য জন্মালো, তারা ছুটে গেল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনি দীক্ষা না দিয়ে আগে বল্লেন অন্তর শুদ্ধ করতে। বারোবছর কঠিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে ভারতের সব তীর্থদর্শন করলে তবে তিনি তাঁদের মন্ত্র দেবেন। এইবার সেই বারোবছর পূর্ণ হ'লো। তাই চন্দ্রনাথদেবকে দর্শন ক'রে তারা উদ্‌যাপন করতে এসেছে তাদের ব্রত।

কি জানি কে সেই মহাপুরুষ, এদের মধ্যে তিনি কি দেখেছিলেন। মনে পড়লো বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, ও পরমহংসদেবের কথা। তাঁরা সবাই ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন সাধনার জন্য। কামিনী কাঞ্চন ছিল তাঁদের মুক্তির পথে বাধা। এরা তবে কোন শ্রেণীর সাধক—আমি মনে মনে তাই ভাবতে লাগলুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন ছিল শিবরাত্রি।

সকাল সাতটার সময় উঠে আমরা চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করলুম। বিরাট পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে এই দেবতার মন্দির। পাণ্ডাঠাকুর এগিয়ে চললেন আর আমরা তাঁর পিছনে পিছনে। আগের রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাহাড়ের পথ পিচ্ছিল ও জলসিক্ত। মায়ের দেহ বেশী ভারী বলে তিনি পাণ্ডা ঠাকুরের কাঁধে ভর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলেন।

দুর্গম পাহাড়—সরু কর্দ্দমাক্ত পথ বনের মধ্যে দিয়ে উঠে গেছে ওপরে ; মাঝে মাঝে পাথরকাটা সিঁড়ি। কোথাও পথ এত সরু যে দুজন এক সঙ্গে চল্‌তে পারে না। আবার আশে পাশে গভীর খাদ, একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্ব্বনাশ! কোন্ অতল গহ্বরে পড়ে মানুষ যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

কোথাও কঠিন খাড়াই, কোথাও বা গভীর উতরাই। পিঁপড়ের সারের মত একসঙ্গে দলবেঁধে তিনলক্ষ লোক চলেছে সেই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের শিখরবাসী দেবতার দুর্ল্লভ চরণ দর্শনে। কারো মনে ভয় নেই, দ্বিধা নেই, কি যেন এক নেশায় পেয়েছে তাদের—তারা যাবেই! কিন্তু এ জোর কিসের? কে বলে ধর্ম্ম নেই, দেবতা নেই? তা যদি না থাকতো ত কোন্ ঐশ্বর্য্যের আশায় আজ এই অসংখ্য নরনারী সকল ক্লেশ তুচ্ছ ক'রে, ঘরের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে এই বিপদসঙ্কুল দুর্গম পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করছে? কৈ, অর্থের লোভে, যশের তাড়নায়, দেশের মুক্তির কামনায় ত এই পরাধীন হতভাগ্য জাতকে কেউ কোনদিন

এক পাও নড়াতে পারেনি তার ঘর থেকে! যে দৃশ্য চোখে দেখলুম তা জীবনে কখনো ভুলবো না। তাই মনে মনে অসংখ্য নমস্কার জানালুম সেই দেবতার চরণে।

সামনে বিরাট চড়াই, অথচ পথ এত সরু যে একটু সন্তর্পণে না গেলেই বিপদ। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—তার ওপর শিবরাত্রির উপবাস। ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে, হাঁপাতে হাঁপাতে একটি একটি ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা উঠতে লাগলুম।

মেয়েদের অবস্থা দেখে আমার ভয় হ'লো। মা ও মাসীমার পা ভেঙ্গে আস্‌ছে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না; বৌদির অবস্থাও প্রায় সেই রকম। তাঁদের হাত ধরে ধরে ওপরে নিয়ে গিয়ে আমি বসালুম—বন্ধু তার আড়াই মন দেহ নিয়ে ততক্ষণে একটা সিঁড়িতে বসে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে দু'একটা লাইন আওড়াচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ ওদিক থেকে বৌদি গান ধরলেন, 'দুর্গম পথ সগৌরবে, তোমার চরণ চিহ্ন লবে।' খুব ভাল লাগলো সে সময় ওই লাইনগুলো—মনে যেন আবার আমাদের নতুন বল-সঞ্চার হলো।

আবার 'যাত্রা কর, যাত্রা কর, যাত্রীদল' বলে চলা সুরু হলো।

পাহাড়ের ওপর অসংখ্য তীর্থ—ব্যাসকুণ্ড, ভৈরবনাথ, সীতাকুণ্ড, উনকোটি শিব গুরুধ্বনি, ভবানী মন্দির, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি। ভীড় ঠেলে একটার পর একটা দেখে আমরা ক্রমশই ওপরে উঠতে লাগলুম। যেখানে যা অনুষ্ঠান করলে ষোল আনা পুণ্য অর্জ্জন করা যায় বলে বিশ্বাস, মা ও মাসীমা পাল্লা দিয়ে, কখনো বা অজস্র ঘুষ দিয়ে, অর্থাৎ প্রচুর দান খয়রাত করে সেটুকু বুঝে নিতে নিতে চললেন।

কপিলাশ্রম থেকে ডানদিকে একটু গেলেই উনকোটি শিব—অসংখ্য পাথরের মুড়ি বা শিব, অন্ধকার পর্ব্বতগুহার মধ্যে মন্দাকিনীর জলে অনবরত স্নাত হচ্ছেন। তা দর্শনে এবং স্পর্শনে নাকি একেবারে শিবলোক প্রাপ্তি! অতি দুর্গম এই স্থান—একদিকে অতলস্পর্শ খাদ, অপরদিকে জঙ্গলাবৃত বিরাট পাহাড়, মাঝখানে অতি সঙ্কীর্ণ পথ উঁচু নীচু হয়ে চলে গেছে। এইস্থানে সবচেয়ে পেশাপেশি ভীড়—গায়ের চামড়া উঠে যায়! মনে হলো বুঝি সমস্ত যাত্রী সেই এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেছে!

একঘণ্টা ধরে সেখানে ঢোকবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে আমরা সেইখান থেকেই নমস্কার করে ফিরলুম। সকলের যেন সর্দ্দিগর্ম্মি হবার জোগাড়, বেরুতে পারলে বাঁচি। মা ও মাসীমার আক্ষেপের আর শেষ রইল না। তাঁরা বললেন, এখানে মরতে পারাও যে পরম সৌভাগ্য!

এমন সময় হঠাৎ, 'গেল গেল' বলে কতকগুলো লোক এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। চেয়ে দেখি সামনে এক বীভৎস দৃশ্য—একটা প্রবল ভীড়ের ধাক্কা লেগে একজন একেবারে পাহাড়ের গায়ে পিশে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে আরও ভীড় এসে পড়ছে তার ওপর। সকলেই চেষ্টা করছে তাকে টেনে বার করতে কিন্তু কেউই পারছে না।

আমি লাফিয়ে পড়ে দু'হাতে ভীড় ছত্রভঙ্গ করে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বাইরে নিয়ে এলুম। একি! এযে সেই সন্ন্যাসিনী!

'সাবাস্, সাবাস্ ভাই', 'বহুৎ আচ্ছা জোয়ান', 'পুরুষ বাচ্ছা বটে', প্রভৃতি অনেক কথাই তখন চারিদিক থেকে আমার কানে ভেসে আসতে লাগল। সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায় ছিল জানি না—হঠাৎ ছুটে এসে আমার চওড়া বুকের ছাতিতে দু'বার হাত ঠুকে বললে—'জিতা রহো বেটা'।

তারপর সন্ন্যাসী ও আমি দু'জনে তাকে ধরাধরি ক'রে দূরে একটা

গাছের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে হাওয়া করতে লাগলুম। সন্ন্যাসিনী কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এত সুন্দর মুখ, এত মধুর দৃষ্টি আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি!

সন্ন্যাসী বললে, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই— আপনি আজ একটা মানুষের প্রাণ রক্ষা করলেন।

মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করলুম। তারপর আনন্দে আর একবার সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাইতেই সেই সুন্দর মুখ থেকে শুধু একটি কথা বেরিয়ে এলো, আপনি আজ আমার যা অনিষ্ট করলেন অতিবড় শত্রুতেও তা করতে পারে না।

যুবক আমি, একজন যুবতী রমণীকে উদ্ধার করবার পুরস্কার স্বরূপ এখনি হয়ত তার কাছ থেকে কিছু মিষ্ট কথা লাভ করবো বলে সাগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম কিন্তু এই একান্ত অপ্রত্যাশিত কথা শুনে নিমেষে আমার তাজা রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তাই একবার তার মুখের দিকে ও একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, তার মানে?

সন্ন্যাসিনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তার মানে, এইখানে মরবার সৌভাগ্য থেকে আপনি আমায় বঞ্চিত করলেন। আমার শিবপ্রাপ্তি হ'লো না, শুধু আপনার এই পরোপকার প্রবৃত্তির জন্যে।

আমি একটু ঠাট্টার সুরে বল্লুম, ও—এই—?

সন্ন্যাসিনী তার মধুর কণ্ঠস্বরকে বৃথা কঠিন করবার চেষ্টা করে বললে, ও-নয়, আপনার অপরাধ অমার্জ্জনীয় তা জানেন?

জানি, কিন্তু না জেনে যা করে ফেলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা ?

আমি বললুম, তবে শাস্তি দিন।

সন্ন্যাসিনী মৃদু হেসে বললে, বেশ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের চন্দ্রনাথ দর্শন হয়, ততক্ষণ আপনি আমাদের ছেড়ে পালাতে পারবেন না, এই আপনার শাস্তি।

আমাদের দল ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু খুব বেশীদূর যেতে পারেনি। সবাই ক্লান্ত, কারো পা আর জোরে চলে না। সিঁড়ি ধরে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এক-একজন করে উঠছিল। সবাই তখন চুপ। কারো আর কথাটি পর্য্যন্ত কইবার শক্তি ছিল না—শুধু তাদের মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল, আর দরদর করে ঘাম ঝরছিল।

সবচেয়ে বিপদ-সঙ্কুল এই পথটা ! প্রায় একমাইল খাড়াই, কোথাও সিঁড়ি আছে, কোথাও নেই—হাতের কাছে একটা গাছ-পালা পর্য্যন্ত ধরবার নেই !

সন্ন্যাসী দম্পতীর অবস্থা খুব কাহিল। তাদের তখন পা ভেঙ্গে আসছে, গা কাঁপছে, কোন রকমে টেনে টেনে তাদের হাত ধরে আমি ওপরে তুললুম।

সামনেই বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির ও তার পাশে বিশ্রামের জায়গা। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, এখান থেকে দেখা যায় দূরে বঙ্গোপসাগরের নীল জল যেন আকাশের সঙ্গে মিশে রয়েছে। প্রাণ মন জুড়িয়ে গেল, সবাই সেখানে বসে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে নিলুম। তারপর দুহাত দিয়ে ভীড় ঠেলে আমি তাদের বিরূপাক্ষ দর্শন করিয়ে নিয়ে এলুম।

ভীড়ের চাপে আমার জামা ছিঁড়ে গেল, দেওয়ালে হাত ছড়ে গিয়ে

রক্ত পড়তে লাগল। সন্ন্যাসিনী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, দেখুন ত, আমাদের জন্যে আপনার কিরকম কষ্ট পেতে হ'লো!

আমি একটু হেসে বললুম, এ শাস্তি ত আগেই আপনার কাছ থেকে মাথা পেতে নিয়েছি।

সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি তার আঁচল দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিলে। যেন সেবা দিয়ে সে আমার সমস্ত কষ্ট লাঘব করতে চায়।

আবার সুরু হলো চলা।

ওই ত চন্দ্রনাথের মন্দির দেখা যাচ্ছে! আর একটা মাত্র চুড়ো—মাইল-খানেকের কম পথ।

বেলা তখন একটা; আমরা গিয়ে পৌঁছলুম চন্দ্রনাথ দেবের মন্দিরে। এখন ভিতরে ঢুকি কি করে? মন্দিরের সরু একটু বারান্দা আর তারি মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ঢোকবার একমাত্র পথ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভীড় দেখে আর ভিতরে যেতে চাইল না, বাইরে একটা গাছের তলায় বসে হাঁপাতে লাগল। সন্ন্যাসিনী কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। এবার তাদের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন, বাবা চন্দ্রনাথ দর্শন করে তাঁর চরণামৃত পান করলে তবে সফল হবে; বারো বছরের তীর্থ-ভ্রমণ সাথক হবে!

আমি বললুম, ভয় নেই, সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, কাজেই সন্ন্যাসীকে চরণামৃত এনে খাওয়ালেই পুণ্য ষোলআনা হবে।

সন্ন্যাসিনী আমার কথা শুনে একটা ছোট্ট হাসি চাপতে চাপতে ভীড়ের মধ্যে ঢুকলো। আমি রইলুম তার পিছনে, দু'হাতে ভীড় আগলে। দেবতা দর্শনের ব্যাকুলতায় তখন তার চোখে মুখে একটা

অলৌকিক জ্যোতি ফুটে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য সে যেন ভুলে গেল তার শ্রান্তি, ক্লান্তি, ইহকালের সব সুখ-দুঃখ!

এরকমের ভীড় আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমরা সারিবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলুম কিন্তু তারি মধ্যে কি ঠেলাঠেলি, পেশাপিশি!

'থাম্ থাম্' করতে করতেও একটা প্রবল ধাক্কা এসে পড়লো সামনে। কে কোথায় যাবে, এক তিল ফাঁক নেই কোনখানে, ভীড়ের চাপে সন্ন্যাসিনী একবারে আমার বুকের মধ্যে এসে পড়লো।

আবার—আবার একটা ধাক্কা এলো তার ওপর। সন্ন্যাসিনী এবার দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে লাগল। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালে পড়তে লাগল, তার বুকের স্পন্দন আমি অন্তরে অনুভব করতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে ভীড়টা হঠাৎ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি সন্ন্যাসিনীকে তখন এগিয়ে যাবার জন্যে ঠেলতে লাগলুম, আমার পিছনে তখন প্রবল ধাক্কা! কিন্তু সে একটুও নড়লো না, চুপ করে আমার বুকের মধ্যে যেন কি খুঁজছিল, কি যেন অনুভব করছিল বুঝতে পারলুম না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে একটু চমকে উঠে আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ঠিক সেই সময় আবার পিছন থেকে আর একটা প্রবল ধাক্কা এলো। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত আমরা একেবারে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

যাত্রীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো 'জয় বাবা চন্দ্রনাথ'। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে যেদিক থেকে পারলে সেই বহুবাঞ্ছিত বিগ্রহটিকে স্পর্শ করতে লাগল। ক্ষয়াঘসা কালো পাথরের ছোট্ট শিবলিঙ্গটি ফুলবিল্বপত্রে প্রায় ঢেকে গেছে। সকলের চোখে মুখে কী তৃপ্তির আনন্দ!

সুদূরের পিয়াসী

বিস্ময়ের কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি! তাদের কণ্ঠে একপ্রকার অদ্ভুত আকুতি ফুটে উঠলো সেই দুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করে। তখন যার যা মনের বাসনা ছিল সবাই সব জানালে সেই প্রস্তরীভূত দেবতাকে, সেই পর্ব্বত শিখরবাসী চন্দ্রনাথকে। ভক্তের প্রার্থনায় মন্দির কেঁপে উঠলো। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে সেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে গেল মহাব্যোমে, অনন্ত শূন্যে, পৃথিবী ছাড়িয়ে দেবলোকে, যেখানে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের দেবতা, মহাযোগী শঙ্কর যোগাসনে ধ্যানমগ্ন!

ভীড় ঠেলে আমি কোনরকমে সন্ন্যাসিনীর জন্য একটু পথ ক'রে দিয়ে বললুম, শিগ্‌গির যান, বাবাকে স্পর্শ ক'রে জীবন ধন্য করুন!

কিন্তু সে তার মধ্যে গেল না, যেন আমার কথা শুনতে পায়নি এইভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ভিতরে অসম্ভব ভীড়—গায়ের চামড়া যেন উঠে আসে। তাই আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, তাড়াতাড়ি করুন, দেখতে পাচ্ছেন না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সন্ন্যাসিনী সেইখানে দাঁড়িয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে শুধু দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকাল। তারপর বললে, চলে আসুন, হয়ে গেছে আমার।

বিস্মিত হয়ে বললুম, সে কি! দেবতাকে স্পর্শ করবেন না—চরণামৃত পান করবেন না?

সন্ন্যাসিনী বললে, না।

একটু হেসে আমি বললুম, না হয় আমার জন্যে করুন।

তাতে কোন ফল হবে না, কারণ আপনার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়। বলে সে গম্ভীরভাবে বাইরে বেরিয়ে এলো।

অপেক্ষাকৃত ফাঁকা যায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, ব্যাপার কি বলুন ত ?

কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী বললে, ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে তা আপনার মত বুদ্ধিমান যুবকের বোঝা উচিত।

মাথা চুলকে বললুম, দেখুন, আমাকে দেখে যতটা বুদ্ধিমান মনে করছেন আমি মোটেই ততটা নই।

অর্থাৎ আপনি আমার কাছ থেকে কথাটা বার করে নিতে চান, এই ত ? কিন্তু আমি আপনাকে বলবো না কিছুতেই। এই বলে অত্যন্ত বিরক্তিকর দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইল।

কি অপরাধ করলুম জিগ্যেস করতে পারি কি ?

সন্ন্যাসিনী বললে, আমাকে জিগ্যেস না করে আপনার মনকে করুন।

বিনীতভাবে বললুম, দেখুন আপনার কথাগুলো আপনার চেয়েও রহস্যময় ! যদি স্পষ্ট করে বলেন—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বললে, স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, মেয়েমানুষের সব কথা পুরুষমানুষের কাছে বলতে নেই।

কিন্তু এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে আমি যদি আমার কৌতূহল নিবারণের জন্যে সেকথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি তাহ'লে আশা করি আপনার কাছ থেকে সত্যি উত্তর পাবো।

এই কথা শুনে সন্ন্যাসিনী কেমন যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়লো এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বললে, উত্তর ? সে কি ! আপনি আমার গোপন কথা জোর করে জানবেন নাকি ?

না জোর ক'রে নয়। তবে আমিও ত আপনার জন্যে কিছু কষ্ট করেছি। এটুকু জানবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আমি শুধু জানতে চাই যে এত পরিশ্রম ক'রে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে ঢোকবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেও তাকে স্পর্শ না করে চলে যাওয়ার মধ্যে কি অর্থ থাকতে পারে ?

সন্ন্যাসিনী একটু থেমে বললে, ভেবে দেখলুম আগে মনকে শুদ্ধ করে তবে দেবতাকে স্পর্শ করা উচিত।

আমি বললুম, তার মানে ? যার পরণে গৈরিকবস্ত্র, ললাটে লাল চন্দনের বিন্দু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা—বাহিরে যার বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা, অন্তর কি তার শুদ্ধ নয় ?

সন্ন্যাসিনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত শুধু বললে, না।

না ! আমি চমকে উঠলুম। কে যেন একটা চাবুক মারলে আমার পিঠের ওপর। কিসের একটা অজ্ঞাত বিষে সমস্ত মন রি-রি করতে লাগল। তিক্ততায় আমার কণ্ঠ ভরে উঠলো। বললুম, তবে বাইরে এই শুদ্ধাচারিণীর রূপ দেখিয়ে মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়, কি বলুন ?

ভণ্ডামি !

আহত ফনিণীর মত সন্ন্যাসিনী অকস্মাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তার চোখে একটা তীব্র জ্বালা, মুখে অব্যক্ত বেদনা। কিন্তু তখনই কিছু বলতে পারল না, পাতলা ঠোঁটের দুটি প্রান্ত বার কয়েক কেঁপে আবার থেমে গেল। যেন অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে নিলে।

আমি বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। যেন নতুনরূপে আবার তাকে দেখলুম। মনে হ'লো সে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! বাহিরে স্ফুলিঙ্গ নেই, কিন্তু অন্তরে আছে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি!

সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মুখে পূর্ব্বের সরসতা ফিরে এলো। তখন মুখ টিপে ঈষৎ হেসে সন্ন্যাসিনী আমায় বললে, আমি ভণ্ড হই আর না হই তাতে আপনার কি এসে যায়! আমি ত আপনার প্রণয়িনী নই যে নিজের চরিত্রশুদ্ধির কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে আমি বাধ্য থাকৃবো। তবে যদি আমার রূপ দেখে আপনি মজে থাকেন সে সতন্ত্র কথা।

এই বলে হাস্যোজ্জ্বল চোখে আর একবার আমার মুখের দিকে চাইলে।

আমি এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। সেই দারুণ শীতেও আমার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। এ কথার কি উত্তর দেবো ভেবে না পেয়ে ইতস্তত করতে করতে বলে ফেল্লুম, না আপনার অনুমান মোটেই ঠিক নয়—তবে কি জানেন, যাকে দেখে আমাদের মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনি জাগে তাকে আমরা দেখতে চাই পবিত্ররূপে, দেবী মূর্ত্তিতে।

তাহ'লে আমাকে দেখে আপনার মনে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা দু'ই জেগেছে, কি বলুন?

একটু হেসে বললুম, সে কথা কি এখনো বুঝতে পারেন নি?

সন্ন্যাসিনী বললে, আগে বুঝিনি তবে এখন বেশ বুঝতে পারলুম। তাই স্পষ্ট করে আপনাকে বলছি এই বেলা সরে পড়ুন এখান থেকে। আপনার মত লোক আমি ঢের দেখেছি, যারা মুখে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে রমণীর অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ খোঁজে।

তার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। বললুম, চুপ করুন!

ভুলে যাবেন না যে আপনি নিজে আমায় ডেকে এনেছেন—আমি কুকুরের মত আপনার পেছনে পেছনে আসিনি।

সন্ন্যাসিনী মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আর আপনিও ভুলে যাবেন না যে আমার রূপ এবং যৌবন দুই-ই আছে এবং বহু পুরুষ আমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরে শুধু একটু কৃপাদৃষ্টি লাভ করবার জন্যে।

আমি আমার প্রশস্ত বক্ষকে আর একটু স্ফীত ক'রে বললুম, কিন্তু এ পুরুষের জাত আলাদা।

মুচকি হেসে সন্ন্যাসিনী বললে, পুরুষের মধ্যে যে কোন জাতিভেদ আছে সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বৃদ্ধকে দেখেছি, যুবককে দেখেছি, স্কুলের বালককে পর্য্যন্ত দেখেছি—বলতে আপনাকে লজ্জা করে যে এরা সবাই সমান—পুরুষের মধ্যে কোন বয়সগত পার্থক্য নেই। সবাই নারীর কাছ থেকে চায় এক জিনিষ! এরা বয়েস মানে না, সম্পর্ক মানে না, কিছুই মানে না।

ও, তাহলে দেখছি আমার অনুমানই ঠিক, আপনি 'বহুজনপ্রিয়া'।

বহু জনকে জানি না, তবে আপাতত ত একজনকে দেখছি।

ছি ছি ছি, আপনার লজ্জা করলো না একবারও ঐ কথাগুলোকে মুখে উচ্চারণ করতে?

কণ্ঠে রহস্যের সুর টেনে এনে সন্ন্যাসিনী বললে,সন্ন্যাসীদের যদি ঘৃণা বা লজ্জা থাকতো তাহ'লে কি তারা ঘর ছেড়ে পথে পথে বেড়াতে পারতো?

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিজের নাম করে আর সন্ন্যাসীনামের অপমান করবেন না।

তাই নাকি? আপনার ভক্তি ত দেখছি খুব! তবে জানতে পারি কি সেটা কার ওপর বেশী—সন্ন্যাসী না সন্ন্যাসিনীর?

আমি বললুম, আপনি যদি পুরুষ হতেন ত এই মুহূর্তে আপনার ওই ভণ্ডামি—গেরুয়া বসন টেনে ছিঁড়ে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিতুম। যে বেশ বুদ্ধ, চৈতন্য, মীরাবাঈ ধারণ করে একদিন সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়বল্লভ হয়েছিলেন তার অপমান আমি কিছুতেই এমনভাবে হতে দিতুম না। এই বলে আমি সঙ্গীদের খোঁজ করবার জন্যে সে স্থান ত্যাগ করে ভীড়ের দিকে অগ্রসর হলুম।

পিছনদিক থেকে সন্ন্যাসিনী ডাকল, শুনুন।

মুখে চোখে তার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। আমি কাছে যেতেই সে ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আপনি এখন যা আমার সামনে বললেন অন্য কেউ হলে তা সহ্য করতুম না, তবে নেহাৎ আপনি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন তাই আপনাকে কিছু বললুম না।

আমি বললুম, তাই বললেন না, না বলবার মত কিছু নেই বলে চেপে গেলেন ?

হয়ত বলবার কিছু নেই সত্যি, কারণ যার অপমানের কথা চিন্তা করে আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন তার কারণ আপনি নিজে।

আমি !

রাজেন্দ্রাণীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে সন্ন্যাসিনী বললে, হ্যাঁ আপনি। বারো বছর ধরে আমি যে গেরুয়ার সম্মান রেখে এসেছি, তাকে আজ কলুষিত করেছেন আপনি ?

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা আমার না আপনার ? বাবা চন্দ্রনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে আপনি বলুন দেখি যে আমাকে বক্ষে আশ্রয়

দেবার সময় আপনার মনে কোন কামনা জাগেনি ! সত্যি বলুন, চুপ করে রইলেন কেন ? তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আমি অনেক শুনেছি ! দেবতাদের কখনো চোখে দেখিনি তবে তাদের বহু আলৌকিক কাহিনী আমার কানে এসেছে। কিন্তু একি ! সন্ন্যাসিনীর মুখ থেকে এই কথা শোনবার পরই আমার মনে হলো যেন মন্দিরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাবা চন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন আমার সামনে। তাঁর পরণে বাঘছাল, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, হাতে ত্রিশূল। ত্রিলোচন—ত্রিলোকের আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে তাঁর বদন মণ্ডল থেকে। আমি দু'হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলুম। আমার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

এমন সময় সন্ন্যাসিনী আবার বললে, সত্যি বলুন, দেবতার সামনে মিথ্যা বলবেন না ?

আমি লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ। আপনি বক্ষে আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মাঝে ঝড় উঠেছিল, আমার শিরায় উপশিরায় রক্ত উন্মত্ত তাণ্ডবে নৃত্য করতে সুরু করেছিল সত্যি।

সন্ন্যাসিনী অধীরভাবে বলে উঠলো, তবে আমি যদি বলি যে আপনার সেই কলুষিত অন্তরের স্পর্শে আমার মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে, তবে সে কি আমার দোষ না আমার গেরুয়ার দোষ ?

আমি একথার কি উত্তর দেবো ভেবে পেলুম না, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

সন্ন্যাসিনী স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেলে লোকের মুখ চোখের যেমন চেহারা হয় তাকে তখন ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমশই নীচের দিকে নামতে লাগলুম।

পাহাড়ের চড়াই যেমন কষ্টকর উতরাই তেমনি সহজ। আমি আমার দলকে খুঁজতে খুঁজতে চললুম।

চোখের সামনে দিয়ে কত লোক যাচ্ছে আসছে কিন্তু আমি কাউকেই যেন দেখতে পাচ্ছিলুম না! কারণ আমার মন তখন কি চিন্তা করছিল তা জানি না।

বহু দূর নেমে যাবার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লুম! আমার মনে হ'লো, তাইত, এর জন্যে ত দায়ী আমি—সন্ন্যাসিনীকে তবে কেন মিছিমিছি ভৎর্সনা করলুম। আমারই কামনার কলুষস্পর্শে, তার অন্তর অশুচি হয়েছে। শুদ্ধাচারিণী দেবীপ্রতিমার গায়ে আমি-ই ত কাদা ছুঁড়েছি। দোষ আমার। একজনকে আশ্রয় দিতে গিয়ে, ভীড়ের নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে, আমি সুযোগ নিয়েছি তার পুষ্পকোমল শুচিশুভ্র দেহ-দেউলের।

আমার মনে অনুশোচনা হতে লাগল। ফিরলুম। সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে মাপ চাইতে হবে।

কিন্তু কোথায় গেল সন্ন্যাসিনী?

ওপরে গিয়ে তাকে আর খুঁজে পেলুম না—যেখানে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি চলে এসেছিলুম তার আশেপাশে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। সন্ন্যাসী যেখানে বসেছিল সেখানে গিয়েও তাকে আর দেখতে পেলুম না। নিশ্চয় তবে পিছনের রাস্তা দিয়ে

নেমে গেছে। সেই রাস্তাটা খুব সোজা এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন—অতি সহজেই সেখান দিয়ে নীচে নামা যায়।

এই ভেবে আমি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই রাস্তাটা ধরলুম। হয়ত এখনও তাড়াতাড়ি গেলে পথে তাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে!

কিন্তু একটা উতরাই শেষ করে যেই মোড় ফিরেছি আমাদের দলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। বন্ধু চলেছে সকলের আগে আর পিছনে পিছনে মা, মাসীমা ও বৌদি। আমাকে দেখে বৌদি একটু ফিক্ করে হাসলেন। সে হাসির অর্থ এমনি সুস্পষ্ট যে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার একটা জবাবদিহি করতে যাচ্ছিলুম কিন্তু কিছু বলবার আগেই বৌদি বলে ফেললেন মৃদু ও অনুচ্চস্বরে, কি ঠাকুরপো, সন্ন্যাসিনী বুঝি তাড়িয়ে দিলে?

ঘোরতর আপত্তি করে আমি বললুম, তাড়িয়ে দেবে? এমন সাধ্য কার? এ শর্ম্মা ওরকম ঢের ঢের মেয়ে দেখেছে।

বৌদি বললেন, ও তাড়িয়ে দেয়নি! তবে সন্ন্যাসিনী বুঝি হারিয়ে গেছে, ভীড়ে তাকে খুঁজে পাচ্ছো না?

আমি বললুম, মিথ্যে কথা, কখখনো তা নয়! সন্ন্যাসিনীকে খোঁজবার জন্যে আমার বয়ে গেছে।

বৌদি বললেন, তা নাহ'লে হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়বে কেন? আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? একটা মেয়েমানুষ দেখলে ত আমাদের সকলের কথা একেবারে ভুলে গেলে! এই ভীড়ে আমরা মলুম কি বাঁচলুম একবারও ত খবর নিলে না? আশ্চর্য্য! অথচ তোমারই ভরসায় আমরা এলুম এই দুর্গম তীর্থে।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললুম—

দুর্গম তীর্থ একে বলছেন—তাহ'লে বড় বড় তীর্থ করবেন কি ক'রে—কেদারনাথ, বদরীনাথ, অমরনাথ? এ ত তাদের কাছে ছেলেমানুষ—তাছাড়া দু' দুটো ষণ্ডা ষণ্ডা লোক যখন আপনাদের সঙ্গে রয়েছে তখন আমার আর কি প্রয়োজন! সেইজন্যে যাদের সত্যি কোন সহায় সম্পদ নেই তাদের দেখছিলুম।

শ্লেষাত্মককণ্ঠে বৌদি বললেন, যাদের সত্যি সত্যি কোন সহায় সম্পদ নেই তাদের দেখছিলেন, না কেবল সন্ন্যাসিনীকে দেখছিলেন? মৃদু হাসিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, এই ত তোমার সেই সন্ন্যাসিনীকে ওপরে দেখে এলুম।

আমি বৌদির সঙ্গে আর দু'চারটে বাজে কথা বলতে বলতে হঠাৎ জামার বুক পকেটে হাত দিয়ে বললুম, ওই যা, আমার ফাউনটেন পেনটা কোথায় পড়ে গেছে। বৌদি আপনারা ততক্ষণ এগোন—আমি খুঁজে দেখি কোথায় গেল। এই বলে আমি আবার ওপরের দিকে উঠতে লাগলুম।

বৌদি খিল খিল করে হেসে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

আমি বললুম, হাসছেন যে?

হাসি চাপতে চাপতে বৌদি বললেন, কলম খুঁজতে যাচ্ছো, না সন্ন্যাসিনীকে খুঁজতে যাচ্ছো—সত্যি করে বলতো ঠাকুরপো?

যান, আপনি ভারী দুষ্টু, এই বলে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালুম।

ওপরে গিয়ে আবার সন্ন্যাসিনীকে খুঁজতে লাগলুম কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পেলুম না। তখন মনে হলো বৌদি রসিকতা করলেন না ত? যাই হোক ভগ্ন মনোরথ হয়ে আবার আমি একাকী নামতে সুরু

করলুম সেই নির্জ্জন পথটা দিয়ে। বাঁধা পথে চলা আমার স্বভাব নয়—নতুন পথ আবিষ্কার করার দিকে সর্ব্বদা আমার ঝোঁক। তাছাড়া তখন বেশী তাড়াতাড়ি নামবার চেষ্টা করছিলুম, যদি সন্ন্যাসিনীকে কোন রকমে নীচে নামবার আগে ধরতে পারি। তাই নামতে নামতে যেদিকে একটু পায়ে চলা পথের ইঙ্গিত পাই সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে পথটা সংক্ষেপ করছিলুম।

এইভাবে একটা দুটো ছোট উতরাই সবে পেরিয়েছি এমন সময় দেখি সেই সন্ন্যাসীঠাকুর একটা বেলগাছের ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ছেন।

আমি বললুম, ব্যাপার কি সন্ন্যাসীঠাকুর, এমন সময় বেলপাতা কি হবে?

তিনি বললেন, সন্ন্যাসিনীর দরকার।

সন্ন্যাসিনীর দরকার! তিনি কোথায়?

সন্ন্যাসী আঙ্গুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে বললেন, ওই—ওদিকে আছে—একটা প্রায়শ্চিত্তের জোগাড়ে এখন ব্যস্ত—অবশ্য পাণ্ডা ঠাকুরও আছেন সেখানে—যান না।

প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনে আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। কিসের জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত? এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

সঙ্কীর্ণ একটী পথ নেমে গেছে নীচে ঝর্ণার দিকে। তাই ধরে খানিকটা যাবার পর দেখলুম আর একটা পথ বাঁদিক থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের একটা গহ্বরের মধ্যে মিশেছে। সেইখানে বসে আছে সন্ন্যাসিনী। অপূর্ব্ব তার মূর্ত্তি, সদ্যস্নাতা, সিক্তবসনা, পিঠের ওপর ভিজে চুলের রাশ—কপালে একটী ছোট্ট সিন্দুরের বিন্দু। পাহাড়ের মধ্যে সেই নির্জ্জন বনান্তরালে তাকে ঠিক বনদেবীর মত দেখাচ্ছিল!

সুদূরের পিয়াসী

পাণ্ডাঠাকুর পূজার আয়োজনে অন্যত্র ব্যস্ত। লোকজন বড় একটা কেউ ছিল না সেদিকে। শুধু সেখান থেকে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত লোক চলেছে। আর তাদের মিলিত নিঃশ্বাস থেকে অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে মৌচাকের মত মৃদু গুঞ্জরণ!

আমাকে সেইদিকে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখে চোখে একটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাব। এগিয়ে এসে সে আমাকে বললে, আপনি এখানে এলেন কেন? চলে যান শিগগির।

আমি বললুম, আপনার কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করতে এসেছি।

অপরাধ? না—না, কোন অপরাধ ত আপনি করেননি! দোহাই আপনার—আপনি চলে যান এখান থেকে, আর আমার সর্ব্বনাশ বাড়াবেন না! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতায় তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়লো।

তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে গেলুম। তখন আমার মনে যেন আর একটু সাহসের সঞ্চার হলো। তাই তার কাছে আরো একটু সরে গিয়ে বললুম, আমি বুঝতে পেরেছি কি অন্যায় করেছি আপনার প্রতি।

আমার এই কথা শুনে সহসা সন্ন্যাসিনী খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর বললে, কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি, আপনি অন্যায় যা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় আমার!

তার মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বললুম, বুঝতে পারছি না আপনার কথা!

আমার সঙ্গে আসুন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে

সে নিয়ে গেল সেই ঝর্ণার ধারে—যেখানে স্বচ্ছ জলরাশি সঞ্চিত হ'য়ে পুকুরের মত স্তব্ধ হয়েছিল। সন্ন্যাসিনী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে সেই জলের মধ্যে তাকাতে বললে। দর্পনের মত আমার চেহারা প্রতিফলিত হ'লো তার ওপরে। তারপর ধীরে ধীরে সে বললে, দেখেছেন আপনার চেহারা ?—ওই প্রশস্ত বক্ষ, ওই দীর্ঘ ললাট, ওই চিত্ত-বিভ্রান্তকারী দু'টী কালো চোখ ?

রমণীর মুখ থেকে নিজের দেহের প্রশংসা এই প্রথম আমি শুনলুম। তাই এর উত্তরে তাকে কি বলবো বুঝতে না পেরে শুধু নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসিনী তখন বললে, এবার বুঝতে পেরেছেন কার দোষ ?

আমি তার একখানি হাত ধীরে ধীরে হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললুম, আর আপনি কি কোনদিন আপনার এই মুখের দিকে চেয়ে দেখেছেন !

কয়েক মুহূর্ত্ত মোহাবিষ্টের মত আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ যেন সন্ন্যাসিনীর সম্বিত ফিরে এলো। আমার হাতের মধ্যে থেকে তার হাতখানি টেনে ছিনিয়ে নিয়ে বললে, না না না, আমি আর দেখতে চাই না—আমি ওকথা ঢের শুনেছি—দয়া করে আপনি চলে যান এখান থেকে—তা না হ'লে আমার প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না।

বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে লাগলুম, প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না আমার জন্যে, কেন ? সন্ন্যাসিনী আমাকে তখনো ইতস্তত করতে দেখে বললে, আপনার দু'টী পায়ে পড়ি আর এখানে দাঁড়াবেন না।

ছি ছি আপনি যে কি বলেন—আপনার আদেশই ত আমার যথেষ্ট ! এই কথা বলতে বলতে আমি তখনি সেখান থেকে চলে এলুম।

সুদূরের পিয়াসী

সেদিন কোথা দিয়ে এবং কেমন করে যে এতটা পথ অতিক্রম করে আবার পাণ্ডার বাসায় এসে পৌছেছিলুম তা মনে করতে আজও বিস্ময় লাগে।

আমাকে বাসায় ফিরতে দেখে বৌদি অকারণ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, কি ঠাকুরপো, ফাউনটেনপেন খুঁজে পেলে? কেমন জব্দ করেছি মিছিমিছি সন্ন্যাসিনীর কথাটা বলে—খুব ছুট করিয়েছি না?

বৌদি আমাকে ঠকিয়েছেন মনে করে যতটা হাসতে লাগলেন আমি কিন্তু ততটা ঠকিনি। কারণ আমার মন তখন বলতে লাগল, আমি যা লাভ করেছি তার তুলনা হয় না।

যাই হোক স্নান ক'রে তখন আহারের আয়োজনে মন দেওয়া গেল। মেয়েদের শিবরাত্রির উপবাস। তাঁরা জলস্পর্শ করবেন না। ক্লান্ত দেহে তাঁরা তখন শয্যাগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের তখন ক্ষুধায় নাড়ি জ্বলছে। সকাল সাতটায় বেরিয়েছিলুম আর তখন প্রায় তিনটে বাজে। চাল, ডাল, ঘি, তেল, হাঁড়ি, কাঠকুঠা কিনে এনে আমরা তখন নিজেরাই খিচুড়ী চাপিয়ে দিলুম। তারপর নিজেদের হাতের রান্না খেয়ে অবাক হয়ে গেলুম, মনে হ'ল, আহা, যেন অমৃত খাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রেই বন্ধু পাহাড়ের মত গিয়ে পড়লো বিছানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এমন নাসিকাগর্জ্জন সুরু হলো যে বাইরে থেকে শুনলে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন ভিতরে কোন দৈত্যের দাপাদাপি চলেছে।

দু'টী জোড়া-তক্তপোষের ওপর একদিকে মেয়েরা শুয়েছিল আর এক-দিকে আমরা শুয়েছিলুম। ক্লান্তিতে সবাই অবসন্ন, কাজেই বিছানায় গা ঠেকার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শুধু আমার চোখে ঘুম ছিল না। মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলুম বাইরের দিকে চেয়ে। কখন সেই

সুদূরের পিয়াসী

গেরুয়া রঙের সাড়িটীকে আবার দেখতে পাবো এই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। তিনটে, চারটে, এমন কি পাঁচটাও যখন বেজে গেল, আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। বিছানা আমার গায়ে ফুটতে লাগল। কি হ'লো তাদের? এত দেরী হচ্ছে কেন? ভাবতে ভাবতে চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠে একবার বাইরে বেরিয়ে এলুম। পাণ্ডাঠাকুর তাদের সঙ্গে আছেন এই ছিল আমার ভরসা। কাজেই পাণ্ডাঠাকুর তখনো ফেরেননি শুনে যেন একটু সান্ত্বনা পেলুম। তবুও একবার বাড়ীর অন্দর মহল ও বাইরের দিকটা চোখ বুলিয়ে নিলুম। কি জানি যদি অন্য কোথাও তারা আশ্রয় নিয়ে থাকে? যাত্রীর ভীড় ভয়ানক। লোক গিস্‌গিস করছে পাণ্ডা-ঠাকুরের ঘরে, দাওয়ায়, উঠানে।

আমি আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। সামনের খোলা জানলা দিয়ে বাইরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। শীতের অপরাহ্ন। তখনই যেন আকাশে সন্ধ্যার ছোঁয়াচ লেগেছিল—দূরের গাছপালা, পাহাড়ের মাথা সব অস্পষ্ট হ'য়ে আসছিল। আমি সেইদিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়েছিলুম।

এমনি সময় হঠাৎ আমার নজর পড়লো দূরে পাণ্ডাঠাকুরের ওপর। তিনি আসছেন হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে। নতুন গামছা, কাপড়, আরো কতকি রয়েছে তার মধ্যে। আর কয়েকটি যজমান তাঁর পিছনে।

নিঃশব্দে আমি উঠে বসলুম। একটা অজানা পুলকে আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। রাস্তা থেকে বাড়ী আসবার মাঝে একটা মাটির ড্রেন ছিল—তার ওপর তালকাঠ, বাঁশ ও মাটি দিয়ে নতুন সাঁকো তৈরী করা হয়েছিল। পাণ্ডাঠাকুর এই সাঁকোটা পার হয়ে সদরে পা দিলেন। তারপর সেখানকার সমস্ত যজমানদের কুশল প্রশ্ন করতে করতে

ভিতরে ঢুকলেন। আমি তাঁর পিছনে সাগ্রহে চেয়ে রইলুম। একটি, দু'টি ক'রে কতকগুলি নরনারী তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলে। কিন্তু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী কৈ? তারা ত এলো না! আমি জানলা দিয়ে একটু ভালো করে বাইরের দিকটা চেয়ে দেখলুম। তারপর দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডাঠাকুরের কাছে দাঁড়ালুম।

কিন্তু প্রথমেই তাঁকে সন্ন্যাসিনীর কথাটা জিগ্যেস করতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। তাই অনাবশ্যক কতকগুলি প্রশ্ন আগে তাঁকে জিগ্যেস করলুম। যথা, এবছরে কত যাত্রীর সমাগম হয়েছে, ফি বছরে এই রকম হয় কিনা, পাণ্ডাদের ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হলে যাত্রীরা তখন কোথায় থাকে, বাইরে যারা থাকে শীতে তাদের কষ্ট হয় কি না প্রভৃতি।

পাণ্ডাঠাকুর পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

তারপর যেমন বললুম, যাত্রীদের ভীড়ে আপনাদের এই কটা দিন খুব কষ্ট হয়, কি বলুন?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীব কেটে বলে উঠলেন, না—না—কষ্ট আর কি! আপনারা দয়া করে এসে বরং আমাদের আশ্রয়েই কত কষ্ট পান—আপনারা কত বড় লোক—এই মাটির ঘরে কি থাকা আপনাদের শোভা পায়?

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর এই উচ্ছ্বাসটা চাপা দিতে দিতে বলে ফেললুম—আচ্ছা যাত্রীর যেমন ভীড়, সেই অনুপাতে পাওনা হয় না, কি বলেন?

এতক্ষণ পরে আমি যেন তাঁর মনের কথা টেনে বললুম। তিনি

তখন সখেদে আগেকার দিনের চেয়ে আজকাল পাওনা যে কি রকম কমে গেছে তার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন। তাঁর পিতা পিতামহ থেকে শুরু করে সবে বর্ত্তমান নিয়ে পড়েছেন এমন সময় আমি আবার বললুম—তবে আগে লোকেরা তীর্থ করতে এসে অনেকদিন থাকতো, আজকাল মেরে কেটে তিনটে দিন থাকে, তাতেই এই লোকসানটা বেশী হয়, কি বলুন ?

তিনি বললেন, তিনদিন থাকলে ত বাঁচতুম—আজই দেখুন না অর্দ্ধেকের বেশী যাত্রী ফিরে গেল।

তাই নাকি! বলে আমি বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে এক সময় প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরদের দেখছি না ত ?

পাণ্ডাঠাকুর বললেন, দেখবেন কি করে, তাঁরা ত চলে গেছেন ?

চলে গেছেন ? কখন ?

এই সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে। আর, হ্যাঁ, আপনাকে এই সংবাদটা দিতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে কি তাঁর আলাপ আছে ?

হ্যাঁ। আর কিছু বলেছেন ?

পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, না।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ঘড়িটা বার ক'রে দেখলুম। পাঁচটা বেজে চল্লিশ। তাঁকে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা এই গাড়ীটা ঠিক ক'টায় ছাড়ে ? আমি জানতুম যে পল্লাগ্রামের লোকেরা ঘড়িতে মিনিট, সেকেণ্ড, বলে যে কথাগুলো আছে তা একেবারে হিসেবের মধ্যে গ্রাহ্যই করে না। ওগুলো তাদের কাছে নেহাতি তুচ্ছ। তাই গাড়ীটা ঠিক ক টায় এবং ক'মিনিটে জিজ্ঞেস করতে পাণ্ডাঠাকুর বললেন, পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে।

ঘড়িটা দেখলুম, আর মাত্র ন' মিনিট আছে। ষ্টেশনের কাছেই আমাদের বাসা, তাই কালবিলম্ব না করে ছুটলুম সেই দিকে।

সুদূরের পিয়াসী

ভীড়ে ভীড়! ঠেলেঠুলে যখন প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলুম তখন প্রথম 'ষ্টার্টিং বেল' বেজে গেছে। ট্রেনের কামরাগুলো যাত্রীতে ঠাসাঠাসি। আমি তাড়াতাড়ি কামরাগুলোতে চোখ বুলতে শুরু করলুম। একটা একটা করে যখন প্রায় শেষের দিকে এসে পড়েছি তখন গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। আমি ছুটে শেষ কামরাটার কাছে যেতেই দেখলুম, সন্ন্যাসিনী একেবারে জানলার ধারেই বসে আছে। আর প্ল্যাটফর্ম্মের উজ্জ্বল আলো তার মুখে এসে পড়েছে। সেই উপবাসক্লিষ্ট ঈষৎ ম্লান মুখখানি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকালের ফোটা ফুলের ওপর সন্ধ্যায় চাঁদের আলো পড়ছে! আমায় দেখামাত্র হঠাৎ যেন তার চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। এবং মৃদু হেসে সে বললে, কাকে খুঁজছেন?

আমার কণ্ঠস্বর তখন কাঁপছিল। বললুম, আপনাকে।

মুখটা বাহিরের দিকে বাড়িয়ে সন্ন্যাসিনী বললে, আমাকে? কেন বলুন ত—কোন কি দরকার ছিল?

আমি বললুম, দরকার? না তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—আপনি কি আজই চলে যাচ্ছেন?

ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে সন্ন্যাসিনী বললে, এখনো কি তা বুঝতে পাচ্ছেন না?

গাড়ী তখন রীতিমত চলতে শুরু করেছে। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে বললুম, আপনার বাড়ী কোথায়?

তা আমি বলবো না।

আমি আবার অনুরোধ করতে সে বললে, বোকা, সন্ন্যাসীদের কখনো বাড়ী থাকে? তারা যখন যেখানে থাকে তখন সেটাই তাদের বাড়ী।

তাহলে আবার কোথায় দেখা হতে পারে ?

হেসে উঠে সে বললে, বৃন্দাবনে গো গোঁসাই।

গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চলে গেল। আমি চুপ ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে গাড়ীটার দিকে চেয়ে রইলুম। গার্ডের গাড়ীর পিছনের লাল আলোটি ক্রমশ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে এসে আমি আবার শয্যা গ্রহণ করলুম। সবাই তখনো নিদ্রামগ্ন—একে উপবাস, তায় পাহাড়ে চ'ড়ে সকলের দেহ ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছে। আমারও শরীর অত্যন্ত খারাপ মনে হচ্ছিল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত আমার চোখে ঘুম এলো না। তাই অন্য সকলে যখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে তখন কি একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার অন্তর ছটফট করতে লাগল।

এইভাবে রাত কেটে গেল।

তারপরের দিনটাও আমরা সেখানে রইলুম। 'তেরাত্তির' না কাটলে নাকি তীর্থদর্শনের ফল পুরোমাত্রায় লাভ করা যায় না। শেষে আসবার দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, 'সুফল' নিয়ে আমরা বিছানাপত্তর বাঁধাছাদা করতে লাগলুম। বিকেলে গাড়ী।

এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর একটা বিরাট খাতা নিয়ে এলেন, তাতে আমাদের নাম ধাম বিবরণ সমস্ত লিখে দিতে হবে। আমরা প্রত্যেকে সেই খাতায় সই করে দিলুম। এই খাতাখানাই তাদের সর্ব্বস্ব, তাদের ব্যবসায়ের একমাত্র পুঁজি। সই করতে করতে আমার গা বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কতদিন পরে হয়ত আমার পুত্র কন্যা, পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র এই তীর্থ দর্শন করতে এসে আমার এই হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হবে। কেউ বা তাদের বহুদিনগত পিতা পিতামহের নিজের হাতে

লেখা এই সইটার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে—কেউ বা হয়ত পূর্ব্বপুরুষের এই স্বাক্ষর ঈষৎ কম্পিত হস্তে স্পর্শ করবে। সেই অনাগত যুগের ভাবী বংশধরদের পুলকমিশ্রিত মুখমণ্ডলের কথা স্মরণ করে আমার হাতটা মুহূর্ত্তের জন্য একটু কেঁপে উঠলো।

আমি সকলের শেষে সই করলুম। কালিটা শুকবার জন্য 'ব্লটিং পেপারের' খোঁজ করতে গিয়ে খাতার ভিতরে হঠাৎ একটা মেয়েলী হাতের লেখা দেখে আমার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

পাণ্ডাঠাকুর বললেন, এ সেই সন্ন্যাসিনীর সই!

পেয়েছি ঠিকানা! আমার মন আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। অতি সুন্দর মেয়েলী হরফে লেখা, শ্রীমতী মেনকা দেবী, স্বামীর নাম ব্রজেন্দ্র বাগচী, বাড়ী কদমকুঁয়া, পাটনা।

চট্ করে বাইরে এসে একটা কাগজে সেই ঠিকানাটা টুকে নিলুম!

তীর্থস্থানে এসে মিথ্যা কথা বলতে নেই। তাই এই পরিচয় যে অতি সত্য সে সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রইল না। বরং এই কথা ভেবে তখন আমি মনে গর্ব্ব অনুভব করতে লাগলুম যে সন্ন্যাসিনী আমাকে যে ঠিকানা গোপন করবার জন্য এত রহস্যের অবতারণা করেছিল বাবা চন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় আমার কাছে তা উদ্ঘাটিত ক'রে দিলেন। বাড়ীর ঠিকানা যখন পেয়েছি তখন একদিন না একদিন আবার দেখা হবেই, এই চিন্তায় আমার মন সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। পুনরায় সন্ন্যাসিনীর সেই রসিকতাপূর্ণ কথাটী আমার মনে পড়লো, বৃন্দাবনে গো গোঁসাই!

পরমোৎসাহে তখন মোটঘাট বেঁধে সকলকে নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলুম। চন্দ্রনাথদর্শন আমাদের শেষ হলো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখন হাওড়া জেলার এক পল্লীগ্রামে আমি থাকি। মার্টিন কোম্পানীর ট্রেন সমস্ত দিনে সেখানে দু'খানা যায় আর দু'খানা আসে। রেলষ্টেশন থেকে আমাদের গাঁ সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে। গোযান কিংবা পদব্রজে ছাড়া যাবার আর কোন উপায় নেই। আমরা হেঁটেই যাতায়াত করি। কেননা পদব্রজে যেতে গো-গাড়ীর চেয়ে সময় অনেক কম লাগে। বর্ত্তমান সভ্যতার কোন নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায় না। দু'শোবছর আগেও তারা যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে বললে একটুও ভুল হয় না। উন্নতি বলতে জ্ঞানের রাজ্যে অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধি ও লেখাপড়ার দিকে কিছু হয়েছে হয়ত! কেননা তদানীন্তন কালের পাঠশালা এখন হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে—চেটাই গিয়ে বেঞ্চি হয়েছে, গুরুমশাইয়ের স্থলে মাষ্টারমশাই। তাছাড়া বনজঙ্গল, ম্যালেরিয়া, পচাপুকুর, কাঁচা রাস্তা, কুসংস্কার সবই আছে। পায়খানা কি জিনিষ সেখানকার লোকেরা এখনো জানে না। মেয়েরা মাঠে যায়—পুকুরে কাদা মেখে মাছ ধরে—পুরুষদের সঙ্গে এক ঘাটে ঘোমটা টেনে স্নান করে। লজ্জা নারীর অঙ্গের ভূষণ একথা বোধকরি সেখানকার মেয়েদের দেখেই কোন মহাপুরুষ প্রথম লিখে গিয়েছিলেন। কেননা শুধু পুংলিঙ্গ হ'লেই হলো, ব্যস্ লজ্জায় সেখানকার মেয়েরা একেবারে ঘোমটা টেনে দেয় বুক পর্য্যন্ত। ছোট বড় নেই—বয়সের পার্থক্য নেই—চৌদ্দ বছরের ছেলে থেকে চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-জীবে সমভাবাপন্না। ঘোমটার মধ্যে অবশ্য তারতম্য আছে। তবে পুরুষ-জাতটাকেই তাদের অবিশ্বাস। এক কথায় অসূর্য্যম্পশ্যা সেখানকার নারী।

সুদূরের পিয়াসী

আমি এই সমাজের মধ্যে মানুষ হয়েছি এবং ছেলেবেলা থেকে শুধু দেখছি এদের অবগুণ্ঠন। রূপসী বলতে যা বোঝায় সে রকম রমণী ত একটিও চোখে পড়েনি, অধিকন্তু অতি কুৎসিত বলে যাদের দিকে তাকাতে ঘৃণা হয় তারা পর্য্যন্ত দেখেছি আমাদের দেখে ঘোমটা টেনে দেয়। এদের দেখে আমার হাসি পায়, আবার দুঃখও ধরে। মনে পড়ে এই অবগুণ্ঠনটা যাদের জন্য প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তাদের কথা। হায়! সেই সর্ব্বনাশী রূপসীরা আজ কোথায়! যাদের দেখে পুরুষ হয়ে উঠতো উচ্ছৃঙ্খল, লালসার বহ্নিশিখায় তাদের সংযমের সকল বন্ধন পুড়ে ছারখার হয়ে যেত! বিচিত্র-কালের গতি! তাই এখন রূপ নেই আছে শুধু অবগুণ্ঠন, পুরুষ আছে কিন্তু নেই তার সেই অসংযম। তবুও কিন্তু স্বভাবের ধর্ম্ম একেবারে মরে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মনে জাগে রূপতৃষা। বিস্মিত হ'য়ে সে দেখে তার নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে সেই রমণীকে বহুরূপে—মা, বোন, খুড়ী, মাসি, পিসির মধ্যে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যে পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছি সেখানে এ সুযোগও ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই নারীর সংস্পর্শ আমি কোনদিন পাইনি—তারা বরাবর পরের মত আমায় দূরে রেখেছে! তাই বাল্যকাল থেকে এই রমণীজাতির প্রতি আমার একটা অদ্ভুত মোহ ছিল, দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ ছিল। যাকে কখনো পাইনি অথচ কল্পনায় দেখেছি—জগতের সমস্ত মাধুর্য্যের খনি, রসের আধার, রমনীয় গুণের উৎস বলে—তাকে পাবার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা কাঙ্গাল হয়ে থাকত।

তাই বহুদিন অতীত হলেও আমি সেই সন্ন্যাসিনীকে ভুলতে পারিনি। এমন কথা, এমন হাসি, এমন রসিকতা আমার সঙ্গে আর কোন রমণী

ইতিপূর্ব্বে কখনো করেনি। জীবনে আমার সেই প্রথম বিস্ময়। কল্পনার সেই প্রথম বিকাশের কথা মনে পড়লে আজো রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, বর্ষার সজল সন্ধ্যায় মন কার চিন্তায় বিভোর হয়, ফাল্গুনের দিনে ফুলের গন্ধ ও চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। কেন এমন হয়? মনকে বারবার প্রশ্ন করি। কেন সুন্দর জিনিষ দেখলে তাকে আমার আপন করবার ইচ্ছা জাগে? কেন যা কিছু ভালো তার প্রতি এই প্রলোভন! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার প্রবৃত্তি কেন আমার হয়? যা আমার কোনদিন হবে না, যাকে আমি কখনো পাবোনা —তার জন্যে কেন মন উতলা হয়, আজো ভেবে পাইনা। ঈশ্বর জানেন! তাই বুঝি ভিখারী, যে একেবারে নিঃস্ব সে-ও ধনীর অট্টালিকার দিকে চেয়ে একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যায়!

আমি দরিদ্র, বেকার—উপার্জ্জনের চেষ্টা যে করি না তা নয়, পল্লী-গ্রামে থেকে যত রকমে সম্ভব চাকরীর উমেদারী করে, শেষে হয়রাণ হয়ে গ্রামের দু'তিনটী ছেলেকে পড়ানো পেশা করেছি। অল্প মাইনে অথচ গাধার পরিশ্রম। তাই দিয়েই কোন রকমে দিন গুজরান করি। আর মাঝে মাঝে ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসায় গিয়ে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চাকরীর জন্য দু'একটা দরখাস্তও করি; কোনটার উত্তর আসে কোনটার বা আসে না। এই ভাবে কোন রকমে দিন কেটে যায় আশা নিরাশায়।

এমন সময় হঠাৎ একদিন একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো। পাটনার কোন এক ধনী ব্যবসায়ী একজন লোক চান বিদেশে ওষুধ ফেরি করবার কাজের জন্য।

পাটনা! কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

যেন সচকিত হয়ে উঠলো। সেই তিনটী অক্ষরের মধ্যে মনে হ'লো যেন আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যে দেশকে কখনও চোখে দেখিনি, এমন কি কোথায়, কেমন ধারা, কিছুই জানি না, তাকেও মনে হতে লাগল যেন আমার অতি পরিচিত স্থান, কতদিনের কত স্মৃতি পড়ে আছে সেখানে।

সেইদিনই একটা দরখাস্ত ক'রে দিলুম! আশা ছিল না বিশেষ, কিন্তু তবু—

কয়েকদিন পরে উত্তর এলো, আমাকে সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে। নিশ্চয়ই—দেখা না করলে কখনও চাকরী হয়? খুড়ীমাকে গিয়ে বললুম।

তিনি প্রথমটা একটু আপত্তি করেছিলেন। শেষে যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম যে চাকরী একেবারে নিশ্চিত—তা না হ'লে আমি এত খরচ ক'রে সেখানি যাচ্ছি কেন, তখন তিনি সেই টাকাটা আমায় ধার দিতে রাজী হ'লেন।

পরদিন আমি রওনা হলুম ছোট্ট একটা বিছানা ও কিছু জামা কাপড় একটা সুটকেশে ভরে নিয়ে।

পাটনা জংসন ষ্টেশনে গিয়ে পরদিন যখন নামলুম তখন সকাল নটা।

ষ্টেশন থেকে শহরগামী একটা এক্কা ধরলুম। শেয়ারে চার পয়সা নিলে আদালতগঞ্জ। চমৎকার এক্কা! প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া তীরবেগে ছুটে চলেছে আর আমরা চারজন তার পেছনে বসে আছি গদিপাতা এবং সরু তাকিয়া দেওয়া একটী সিংহাসনের মত উচ্চ আসনে—মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই, ধরে বসবার কোন অবলম্বন নেই। শুধু প্রকাণ্ড দুটী

রবার লাগান চাকা পীচের রাস্তার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ছুটছে। আমার মনে পড়লো বাল্যকালের সেই লাইনটী—'এক্কা গাড়ী খুব ছুটেছে—।

ট্রাম, বাস, রিক্সা, ফিটন কলকাতার শহরে অনেক রকমের অতি-আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত আরামপ্রদ যানবাহন চড়েছি কিন্তু এক্কা চড়ে সেদিন মনে এমন একটা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলুম যা বলা যায় না।

হাতপাতালের সামনে গোবিন্দ মিত্রের রোড। তার মধ্যে ঢুকেই এক্কা থামল একটা হোটেলের সামনে। দোতালা বাড়ী কিন্তু ওপরের ঘরের চাল দেশী টালি দেওয়া। খুব সস্তা ; দু'বেলা খাওয়া ও থাকা মাত্র চোদ্দ পয়সা। মালিক এক বৃদ্ধ—পাকা গোঁফ, বিরাট দেহ, সদরে বসে গড়গড়া টানছিল। আমায় দেখে মধুর হেসে অমায়িককণ্ঠে ভিতরে আহ্বান করলে। সেখানে গিয়ে দেখলুম বহু বাঙ্গালী ছাত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে কতগুলি ছেলে ল' কলেজে পড়ে, কতকগুলি মেডিক্যাল কলেজে। আমি দোতালায় তাদেরি একটা ঘরের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সমবয়সীর প্রতি সকলেরই একটা আকর্ষণ থাকে।

হাসপাতালের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে গঙ্গার ঘাটে। ল'কলেজের ছেলেরা স্নান করতে যাচ্ছিল। আমি তাদের সঙ্গী হলুম। বাড়ীতে পাতকুয়া থেকে চাকর স্নানের জল তুলে দেয় প্রত্যেককে। কিন্তু তোলা জলে স্নান করা আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়। পল্লী-গ্রামের ছেলে আমি, পুকুরে সাঁতার কেটে, জল তোলপাড় করে স্নান করাতে অভ্যস্ত। তাই গঙ্গাস্নানের নাম শুনে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল।

এখানকার গঙ্গা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বিরাট চওড়া—এপার

থেকে ওপার ভাল করে দৃষ্টি চলে না। নীল জল, সর্ব্বদা তরঙ্গ-চঞ্চল। বাঁধা কোন ঘাট নেই—ভাঙ্গা চোরা মাটির পাড়, অসংখ্য পাথরের নুড়ি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত।

ওপরে কাপড় ও জুতা রেখে জলে নামলুম। বরফের মত ঠাণ্ডা জল, নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। তার স্পর্শে সমস্ত দেহ মন জুড়িয়ে গেল। বালিমাটি—তাই অনায়াসে গলাজল পর্য্যন্ত নেমে গেলুম।

গঙ্গা বলতে আমি কালীঘাট ও কলকাতার গঙ্গাকেই জানি। তার কাদা জল ও আবর্জ্জনাময় মলিনতার কথা মনে করলে স্নান করবার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখানকার জল ছেড়ে আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সাঁতার কেটে, অনেকগুলো ডুব দিয়ে যখন উঠলুম তখন যেন আমার সমস্ত দেহ স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো।

স্নান করে এসে খেতে বসলুম। চাকর পিঁড়ে পেতে, জলের গ্লাস দিয়ে গেল। ঠাকুর এসে ভাত বেড়ে দিলে।

আমি বললুম, ঠাকুর একটু নুন দিয়ে যাও। পাশে বসে যারা খাচ্ছিল তারা আমায় চুপিচুপি বললে, ঠাকুর বলবেন না—তাহলে ওরা ভয়ানক চটে যায়! ওদের বলবেন বাবাজী। কেননা বিহারীরা নাপিতকে ঠাকুর বলে। সর্ব্বনাশ! একই কথার যে এক এক দেশে এক এক অর্থ তা কি করে জানবো? বাংলা ছেড়ে বাহিরে আসা এই আমার জীবনে প্রথম!

বাবাজী! ব'লে মোটা ও ধরা গলায় কে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। আমি চমকে উঠলুম। ব্যাপার কি! দেখি না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে রাঁধুনী বামুন ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে উঠোনের ওপারে পর্দ্দা-ঘেরা যে দরদালান তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আবার ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের পরিবেশন করতে লাগল।

সুদূরের পিয়াসী

আমি যখন একমনে বিহারীদের বাঙ্গালী রান্না থেকে রসগ্রহণ করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আবার এক হুঙ্কার সেই মোটা চটের পর্দ্দা ভেদ করে শব্দভেদী বানের মত আমার কাণে এসো পৌঁছল—পান্—এ—পান্নু ?

ভীত ও ত্রস্ত হয়ে চাকরটা তখনই উত্তর দিলে, জী, সরকার !

তখন অদ্ভুতকণ্ঠে ও বিহারী ভাষায় অতিদ্রুত পর্দ্দার ভেতর থেকে যে সব কথা ভেসে এলো আমি তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলুম না। শুধু দেখলুম, মিনিট দুই পরে একটি বাটীতে মাছের ঝোল নিয়ে আর একজন লোক আমার পাতের কাছে এসে ঠক করে বসিয়ে দিয়ে গেল। বিহারীরা নিরামিষ-ভোজী তবে এই হোটেলে বাঙ্গালী বাবুদের জন্যে মাছের ব্যবস্থা আছে এবং আমাকে এতক্ষণ মাছ দেয়নি তাই লক্ষ্য করে এই হুঙ্কার।

আমি পাশের বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীকে জিগ্যেস করলুম, ওই চটের মধ্যে থেকে কিসের আওয়াজ আসছে মশায় ?

তিনি অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, আরে ওই ত মালেকান মশায়।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, মালেকান ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মালিকের স্ত্রী ! সকলের অলক্ষ্যে থাকলেও আসলে হোটেলটা চালাচ্ছে ও। ওর প্রখর দৃষ্টি সর্ব্বত্র ! আর ওর স্বামীটাকে যে দেখছেন ও কিছু নয়, শুধু বসে বসে তামাক টানে, ব্যস্।

কথাটা যে কতদূর সত্য তা খেতে খেতে ওই সময়টুকুর মধ্যেই বার বার মালেকানের হুঙ্কার শুনে বুঝতে পারলুম। কিন্তু কি প্রখরদৃষ্টি এই মহিলাটীর ! কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা হবার উপায় নেই। প্রহরীর মত দিনরাত্তির তার দু'টী চোখ সেই পর্দ্দার মধ্যে থেকে সকল কাজের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘর, দোর, দালান, পাতকুয়াতলা, রান্নার

সরঞ্জাম—বাটনাবাটা থেকে কুটনোকোটা পর্য্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত যথারীতি হ'য়ে যাচ্ছে। কারো ফাঁকি দেবার উপায় নেই। লোকজন তার ভয়ে সন্ত্রস্ত! অথচ হোটেলটি ছোট নয়। বাইরে থেকে যেমন দেখায় আসলে কিন্তু তার চেয়েও ঢের বড়। যারা সেখানে ঘর নিয়ে থাকে তাদের ডবলের চেয়েও বেশী লোক বাইরে থেকে শুধু খেতে আসে। কম দামের হোটেলের মধ্যে এদেরই নাকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল ও পরিষ্কার।

শুধু সকালের লোক সমাগম দেখেই আমি বুঝতে পারলুম এর কত সুনাম! এক অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানী মহিলার কর্ম্মক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়লো! এদের পাশে তাদের দাঁড় করাতে আমার যেন মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা স্বামীকে সাহায্য করা দূরে থাক, নানা রকমে উদ্ব্যস্ত করে তোলে—আর এদের দেশের মেয়েরা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা করে—তাদের পরিশ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সেবা দিয়ে। তারা যখন প্রেরণা দেয়, শক্তি দেয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তখন দেয় হতাশা ও কর্ম্মবিমুখতা।

খাওয়া দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রা সেরে নেবার জন্য বিছানাটা ভাল করে পরিষ্কার করছিলুম। আমারই পাশের শয্যায় আর-একটি ভদ্রলোক ততক্ষণ শুয়ে পড়ে সিগারেট টানছিলেন। একই ঘরে যার সঙ্গে বাস করতে হবে তার সঙ্গে আলাপটা জমাবার জন্যে প্রথমেই সেই হোটেলটির ভালো বন্দোবস্তের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলুম। আর যায় কোথায়? গ্রামোফোনে একবার দম দিয়ে চালিয়ে

দিলে সে যেমন আপনি বাজতেই থাকে তেমনিভাবে সেই ভদ্রলোক তখন শুরু করলেন হোটেলের কথা।

তিনি কলকাতার কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি, প্রতি মাসে একবার করে এখানে আসেন তাঁর ব্যবসার তদ্বির করতে। কাজেই তিনি যে আমার চেয়ে বেশী এই হোটেলের বৃত্তান্ত জানেন সেইকথা জানাবার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সেই একই হোটেলে এসে কবে তিনি কি দেখেছিলেন, সমস্ত এক সঙ্গে আমাকে শোনাবার জন্যে প্রাণপণে গলাবাজী করে চললেন।

নিদ্রায় তখন আমার চোখ জুড়ে আসছিল এবং মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিলুম। এমন সময় তিনি গলাটা একটু খাটো করে একবার দরজার দিকে পিছন ফিরে দেখে নিয়ে বললেন, জানেন, ওই মালেকান তার পুরুষটিকে বার করে এনেছে!

অকস্মাৎ যেন আমার ঘুম ছুটে গেল। বিস্মিত হয়ে বললুম, বলেন কি মশায়, চিরকাল ত জানি পুরুষরাই মেয়েদের বার করে—এ যে একেবারে উল্টো ব্যাপার!

তিনি বললেন, ওই ত মজা! একথা আর কেউ জানে না। নেহাত আমি দশবছর ধরে এখানে আসা যাওয়া করছি তাই জেনে ফেলেছি।

কেমন করে জানলেন?

আরে মশায় সে অনেক কথা। সবে তখন দ্বিতীয়বার এখানে এসেছি। হঠাৎ একদিন রাত্রে হৈ চৈ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীচে গিয়ে দেখি পুলিশ নিয়ে মালিকের স্ত্রী ও তার বাড়ীর লোকেরা এসে হাজির—মালিককে জোর করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তারা। বুড়ো ত চলে

যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ মালেকান ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে বললে, কোথায় যাচ্ছ ?

বুড়ো বললে, আমায় ছেড়ে দে, বাড়ী যাই। আর জোর করে ধরে রাখিসনি।

মালেকান বললে, তুই যাসনি তোর কোন ভয় নেই। তোর কাছ থেকে আমি একটা পয়সাও চাইবো না। আমি নিজে রোজগার করে তোকে খাওয়াব।

বুড়োও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। আর সেই থেকে দু'টীতে বেশ আছে। কেউ কাউকে ছেড়ে একদিনের জন্যেও কোথাও নড়ে না।

আমি বললুম, বুড়োর বৌটার কি হ'লো ?

কি আর হবে, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল এবং শুনেছি তার কিছুদিন পরে নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

কবে আমাদের দেশ থেকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই অন্যায় অত্যাচার দূর হবে এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে হিন্দুস্থানী মেয়েটির কথা আলোচনা করতে আমার আনন্দবোধ হচ্ছিল, যখন শুনলুম সে-ই আর একটি নির্দ্দোষ ও সরলা বালিকার মৃত্যুর কারণ—তারি জন্য একটি সংসারের পারিবারিক শান্তি একেবারে বিনষ্ট হয়েছে তখন আমার মন আবার তারি কথা ভেবে বিষিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর, সেই বাড়ীর চেহারা বদলে গেল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, একটা অন্যায়কে যেন আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি। তখনি আমার সেইস্থান পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সেইদিন বিকালেই চাকরীর স্থলে দেখা করবার কথা—তাই তার ফলাফল না জেনে কোন নতুন ব্যবস্থা করবো না স্থির করলুম।

যাই হোক ভগবানের কৃপায় সেইদিনই আমার চাকরী ঠিক হয়ে গেল। আমার চেহারা দেখে মনিবের খুব পছন্দ হ'লো। বললেন, তোমায় স্যুট্ পরতে হবে।

আমি রহস্য ক'রে বললুম, আমায় স্যুট্ করলেও আমি স্যুট্ পরতে পারবো না।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কোমর চুল্‌কতে চুল্‌কতে হিন্দুস্থানী প্রভুটি বললেন, কেঁও? আপতো দেখনে বহুত স্মার্ট হ্যায়, স্যুট্ পরনেসে আউর জায়দা স্মার্ট মালুম হোগা।

আমি বললুম, বেশী স্মার্ট হ লে লোকে আবার ছেলেমানুষ মনে করবে, তাতে তোমার কাজের ক্ষতি হবে। তার চেয়ে এই খদ্দরের পাঞ্জাবী ও চাদরে তোমাদের কাজ বেশী হবে।

আচ্ছা রহনে দেও—কাম্‌কা ক্ষতি হোনেসে স্যুট নেহি মাঙতা।

আমি হেসে নমস্কার করে চলে এলুম। স্থির হ'লো কালই আমায় অফিসে যেতে হবে। হিন্দুস্থানী ওষুধের কোম্পানী—আমাকে দেশ বিদেশে ঘুরে তাদের ওষুধ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। মাহিনা দেবে এবং ভ্রমণের যাবতীয় খরচা দেবে, তাছাড়া প্রতিদিনের খোরাকী বাবদ দু'টাকা অতিরিক্ত!

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলুম। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ করে আনন্দে আমার শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। পরদিনই আমি সেই হোটেলটা ছেড়ে দেবো স্থির করলুম।

তখন সন্ন্যাসিনীর কথা আমার মনে পড়লো। ময়দানের কাছে যে পুলিশের ফাঁড়ি তারি পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, সেইটে ধরে লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে আমি চললুম কদমকুঁয়া।

সুদূরের পিয়াসী

পুরো সন্ধ্যে তখনো হয়নি। সবে দু'একটা বাড়ী থেকে শাঁক বেজে উঠছে এবং কাঁচের সারশির ভেতর দিয়ে কোন কোন বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোও জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। খানিকটা পরেই আমি একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ফটকে লেখা রয়েছে 'মেনকা ভবন'।

সুন্দর ছোট্ট বাড়ীটি। চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান—তাতে বড় বড় ইউক্যালিপটাস, বিলিতি পাম, ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা প্রভৃতি গাছ। তার মধ্যে চারিদিকে সরু সরু লালকাঁকরের রাস্তা আর অসংখ্য ছোট ছোট দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ, লতাবিতান, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরণায় নিখুঁত ক'রে সাজান।

বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। এই কি সেই সন্ন্যাসিনীর বাড়ী? দু'বছর কেটে গেছে, এখন যদি আমায় চিনতে না পারে? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম কি করবো, এমন সময় একটা মালি টিনের ঝারি করে গাছে জল দিতে দিতে একেবারে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ব্রজেন বাগ্‌চীকা কুঠি এহি হায় ?

মালি গেটটা খুলে দিতে দিতে বললে, জী, হ্যাঁ সরকার—বাবুকা সাথ আপকা কই দরিয়াব হ্যায়?

মাথাটা ঈষৎ চুলকে বললুম, হ্যাঁ—হ্যায়—কোঠিমে বাবু হ্যায়?

জী হ্যাঁ সরকার, বাবুত কোঠিমে হ্যায়—আপ বইঠিয়ে দপ্তরমে—এই বলে সে আমায় সঙ্গে করে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল।

'বাবু কোঠিমে হ্যায়' শুনেই মনটা আমার নিস্তেজ হ'য়ে পড়লো। ভেবেছিলুম একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে

তাকে চমক লাগিয়ে দেবো। যাইহোক যখন তা হ'লো না, তার জন্য আর বৃথা আপশোষ করে লাভ কি? তাকে ত আবার চোখে দেখতে পাবো, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য!

আমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে মালি তখন জিগ্যেস করলে, আপ কা নাম কেয়া হায় সরকার?

আমার নাম ত তাঁরা কেউ জানেন না! কাজেই কি বললে ঠিক হবে, বুঝতে না পেরে আমি যেন একটু দ্বিধায় পড়লুম! এমন সময় চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। বললুম, চন্দ্রনাথ-সে এক আদমী আয়া—বলো।

—কেয়া বোলা? চন্—নথ—

আমি বললুম, না, চন্দ্রনাথ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দ্রীনাথ। আব ঠিক হুয়া—আপ বইঠিয়ে বাবু, আব্বি আ যায়গা। এই বলে সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলুম। চন্দ্রনাথের নাম শুনলে হয়ত সন্ন্যাসিনী নিজেই ছুটে আসবেন!

এই কথা চিন্তা করছি এমন সময় মালীটা এসে বললে বাবুর কাছে খবর গেছে, তিনি এখনি আসছেন—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই বলে সে আবার নিজের কাজে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মনে হলো যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে কে নেমে আসছে—তার চটি জুতোর আওয়াজ আমার কানে এলো—বুঝলুম তিনি আসছেন। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখটা একবার মুছে নিলুম। তারপর চাদরটা কাঁধের ওপর ঠিক করে গুছিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলুম।

এমন সময় সামনের পালিশকরা কাঁচের দরজাটা খুলে এক

ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পাঞ্জাবীদের মত বলিষ্ঠ অথচ একহারা চেহারা—অতি সুপুরুষ, চোখে কালো সেলের চশমা, বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম।

প্রতিনমস্কার করে তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কাকে চান আপনি?

আমি বললুম, আজ্ঞে ব্রজেনবাবু আছেন?

তিনি বললেন, আমিই ব্রজেনবাবু, বলুন কি দরকার?

আমি 'নার্ভাস' হয়ে পড়লুম, কপালে আমার ঘাম দেখা দিল। বললুম, দেখুন তাহ'লে বোধহয় ঠিকানা ভুল হয়েছে! ব্রজেন বাগচী বলে এখানে—মানে কদমকুঁয়ায় কি আর কোন লোক থাকেন?

তিনি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, আমার যতদূর মনে পড়ে পাটনা শহরে এই নামে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। অন্তত আমি এখানে ষোল বছর আছি, আমি ত শুনিনি মশাই। তারপর একটু থেমে আমার দিকে চেয়ে আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

একটু ঢোঁক গিলে, বার দুই কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললুম, আমি আসছি অনেক দূর থেকে—হাওড়া জেলার এক গ্রাম থেকে।

তিনি বললেন, কি দরকার শুনতে পারি কি?

বললুম, শুনতে পারেন—অবিশ্যি এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। এসেছিলুম পাটনায় কাজে তাই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলুম। অথচ ঠিকানা ত ভুল হবার নয়—একেবারে নির্ভুল ঠিকানা আমি নিজে হাতে লিখে নিয়েছি!

তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, তাহ'লে আপনি আমায় চিনতে পারছেন না—ঠিকানা হয়ত ঠিকই আছে।

আমি বললুম, চিনতে পারছি না কি মশায়—তাঁর সঙ্গে যে একত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি।

তিনি একটু রহস্য করে বললেন, কোথায় বলুন ত?

আমি বললুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। বছর দুই আগে, তিনি আর তাঁর স্ত্রী মেনকা দেবী সেখানে গিয়েছিলেন। দু'জনেরই পরণে গেরুয়া, সন্ন্যাসীর বেশ—তাঁদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম সেই ভদ্রলোকের মুখ পাথরের মত কঠিন হ'য়ে গেল। চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ক্রমশ তাঁর চোখদুটো বিস্ফারিত হতে লাগল এবং কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎক্ষিপ্তদৃষ্টি তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠলো।

আমার বুক তখন ভয়ে দুর দুর করে কাঁপছে। একি হ'লো! যে লোকটি এতক্ষণ আমার সঙ্গে এমন মধুরভাবে আলাপ করছিল তার এ কি পরিবর্ত্তন! বুঝতে না পেরে আমি যেন ঘাব্‌ড়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাকে নমস্কার ক'রে বললুম, আচ্ছা তাহ'লে আমি আসি—মিছিমিছি আপনাকে এত কষ্ট দিলুম ব'লে ক্ষমা করবেন।

তিনি আমার এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই সেখানে বসে রইলেন।

তারপর আমি ধীরে ধীরে উঠে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে যেমন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি অমনি তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, দাঁড়াও।

চমকে উঠে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

তিনি তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে চেয়ার থেকে উঠে এসে খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে বললেন, বসো।

আমি কোন কথা না বলে আবার নিঃশব্দে তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লুম। তখন তিনি ফিস্ ফিস্ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, কি বললে, আমি ব্রজেন্দ্র বাগচী নই ?

মাথাটা চুলকে বললুম, হয়ত আপনি ব্রজেন্দ্র বাগচী কিন্তু আমি যাঁকে খুঁজচি আপনি তিনি নন্ ?

চাপা অথচ গম্ভীরকণ্ঠে তিনি যেন আমাকে একেবারে মারতে উঠলেন। বললেন, কে বলেছে নয় ?

আমি বললুম, আমি যে তাঁকে চিনি।

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা। কখ্খনো তুমি তাকে চেনো না।

আমি ভীতকণ্ঠে বললুম, আজ্ঞে আপনাকে আমি চিনি না সত্যি কিন্তু মেনকা দেবীর স্বামীকে চিনি।

Shut up liar ! তুমি তাকেও চেনো না। এই বলে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, তুমি মেনকা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হতে দেখেছ ?

আমি বললুম, আজ্ঞে না, তা কি করে দেখবো—তবে তীর্থস্থানে গিয়ে পাণ্ডার খাতায় ত কেউ মিথ্যে নাম লেখাতে পারে না। আমি নিজের চোখে যে সে লেখা দেখেছি।

আবার ধমক দিয়ে তিনি বললেন, কি লেখা দেখেছ ?

আমি বললুম, মেনকা দেবী, স্বামী শ্রীব্রজেন্দ্র বাগ্চী, কদমকুঁয়া—

ব্যস্—

আমি চুপ ক রে গেলুম।

তথন তিনি বললেন, আমিই সেই ব্রজেন্দ্র বাগচী—

কিন্তু আমি যে তাঁর স্বামী বলে অন্য ব্যক্তিকে—

তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুপ। আমি ছাড়া তার স্বামী আর কেউ নেই। এই বলতে বলতে তিনি ডাক দিলেন 'খুকু' বলে।

ফুটফুটে একটি বছর দশেকের মেয়ে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হ'লো।

আমি চমকে উঠলুম! আশ্চর্য্য—তার চোথ দুটি ঠিক সন্ন্যাসিনীর মত।

মেয়েটির হাত দৃঢ়ভাবে ধরে তখন তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, বলুন একে কার মত দেখায়—সত্যি ক'রে বলুন? মিথ্যা বললে, চাব্‌কে দেবো। এই বলে থপ্ করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে বাঁহাতে একটা চাবুক বার করলেন।

সর্ব্বনাশ! একি প্রশ্ন? ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। একটা পাগলের পাল্লায় শেষে এসে পড়লুম নাকি!

তিনি বললেন, বলো সত্যি করে?

আমি বললুম, চোখ দুটি অবিকল মেনকা দেবীর মত—মায় বাঁ দিকের ঠোঁটের কোণে সেই কাল তিলটি পর্য্যন্ত। আর বাকী দেহটার সঙ্গে আশ্চর্য্য আপনার মিল!

তিনি লাফিয়ে উঠে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, Exactly! তাহ'লে আমার কথা ঠিক ত?

আমি হ্যাঁ-না কিছু বলবার আগেই তিনি আমার হাতটা ধরে টানতে টানতে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর মার্ব্বেল পাথরের সুন্দর

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে, একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আদেশ করার ভঙ্গীতে বললেন, জুতো খোলো !

তারপর সেই ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে তিনি আবার আমায় হুকুম করলেন, ঢোক ঘরের মধ্যে।

সুবোধ বালকের মত তৎক্ষণাৎ তাঁর আজ্ঞা পালন করলুম। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। এত সুন্দর সাজানো ঘর ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো দেখিনি। এ যেন ইন্দ্রপুরী ! পুরু কার্পেট দিয়ে মেঝেটা আগাগোড়া মোড়া। অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত ছাদ ! তাথেকে কাঁচের বৈদ্যুতিক ঝাড় আলো ঝুলছে, পেণ্ট করা ঘরের দেওয়ালে বিলিতী আর্টিষ্টদের বড় বড় ছবি সোণালী ফ্রেমে বাঁধানো, পিতলের টবে নানারকমের গাছ, বিচিত্রবর্ণের ফুল ফুটে আছে তার ডালে ডালে—তাজা ফুলের মৃদু গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত—দরজায় জানলায় নেটের বিলীতি ঝালর ও পর্দ্দা বাহিরের মৃদু হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘরের মধ্যে একদিকে মখমলে মোড়া একসেট সোফা, কাউচ—আর একদিকে একটি ছোট টেবিল হারমোনিয়াম।

আমি দু'চোখ ভরে দেখছিলুম বিলাসের সেই সব উপকরণ !

এমন সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, কি দেখছো অমন করে ?

এই কথা শুনে আমি প্রথমটা অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লুম। তারপর চট ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললুম, ভারী সুন্দর রুচি ত আপনার !

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, আমার নয়।

তাঁকে একটু খুশী করবার চেষ্টায় আমি বললুম, তার মানে ? এ বাড়ী ঘর দোর সব আপনার অথচ এই দুর্ল্লভ শিল্পীজনোচিত সৌন্দর্য্যবোধ আপনার নয় বলতে চান ?

তিনি তখন আমার হাত ধরে টানতে টানতে সেই ঘরের দরজার মধ্য দিয়ে পাশের আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার কিছুই নয়—সব ওর। এই বলে দেওয়ালে টাঙানো একখানা প্রকাণ্ড অয়েল পেণ্টিংয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ছবির দিকে চেয়ে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলুম না। এ যে সেই সন্ন্যাসিনীর বিয়ের ছবি—তার গলায় একটা তাজা ফুলের মালা, চোখে ও মুখে সেই অদ্ভুত হাসি! ছবি নয়, এ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি! আমি জীবনে কখনো এমন প্রতিকৃতি দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন তার সর্ব্বাঙ্গ হাসছে—চোখ হাসছে, নাক হাসছে, পাতলা দু'টি ঠোঁট হাসছে, কপালের ওপর লতিয়ে- পড়া গুচ্ছ-গুচ্ছ চুলগুলি হাসছে, মুক্তোর মত দাঁতগুলি হাসছে,—গালের ওপরের কাল তিলটি হাসছে, শাঁখের মত ধবধবে খাঁজকাটা গলাটি পর্য্যন্ত হাসছে! তাছাড়া এ ঘরটি যেন আরো বেশী সাজানো। এখানে যেন আরো বেশী মানিয়েছে এই ছবিটিকে।

আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে তিনি বললেন, কেমন দেখছো?

আমি বললুম, অদ্ভুত!

নাসিকা কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, নন্‌-সেন্‌স—হেভেন্‌লি! শেষের শব্দটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, এ রূপ পৃথিবীতে আর দেখা যায় না!

আমি বললুম বিশেষ করে আমাদের দেশে এ যেন একটা আকস্মিক ঘটনা!

তিনি ঈষৎ রুষ্টস্বরে বললেন, আমাদের দেশে—what do you mean? আমি বেট্ রাখছি সারা পৃথিবীতে তুমি এরকম আর পাবে না।

আমি বললুম, পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিন—কে আর সেখানে গেছে বলুন।

তিনি চটে উঠে বললেন, কেন, আমি গেছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর দেশগুলো দেখে এসেছি—কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি।

বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বললুম, আপনি পৃথিবীও ঘুরেছেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী, চীন, জাপান সব ঘুরেছি !

শ্রদ্ধায় আমি মাথা নীচু ক'রে রইলুম। পরে জানলুম বেনারস ইউনিভারসিটি থেকে তিনি ষ্টেট স্কলারসিপ নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন সেই সব শিক্ষার কেন্দ্র !

আমি চেয়ে রইলুম সেই রূপে-গুণে-বিদ্যায় অসাধারণ পুরুষটির দিকে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেই ছবির পাশে একটি অতি সুন্দর ঘরে সুসজ্জিত বিছানার ওপর। পাশাপাশি দু'টি বালিশ দেখেই আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলুম, এইটে বুঝি আপনার শোবার ঘর ?

তিনি বললেন, আমার না—ওর। এখানে যা কিছু দেখছেন সব ওর হাতে সাজানো। আমি কেবলমাত্র ওর faithful servant—শুধু সযত্নে রক্ষা করছি।

আমি হেসে উঠে বললুম, বেশ বিনা মাইনের চাকরী ত আপনি পেয়েছেন।

তিনি বললেন, হাসছো—জানো এরকম মনিবের চাকরী পাওয়া পরম সৌভাগ্য !

আমি বললুম, নিশ্চয়ই। আচ্ছা একবার ডেকে দিন ত তাঁকে, বহুদিন দেখিনি—এখন কি তিনি চিনতে পারবেন আমাকে ?

তিনি রেগে উঠে বললেন, কি রকম ভদ্রলোক আপনি—পরস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান—জানেন তিনি অত্যন্ত পর্দ্দানশীন !

আমি বললুম, বলেন কি ! চন্দ্রনাথে যে আমি তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে।

চন্দ্রনাথ ! আমার স্ত্রী ত কোনদিন সেখানে যাননি !

আমি বললুম, সে কি মশায় ! পরণে গেরুয়া, সন্ন্যাসিনীর বেশ—দেহে কোথাও কোন ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন নেই। উপবাসক্লিষ্ট মুখ, কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষে পাণ্ডাঠাকুরের রান্নাঘরের বারান্দায় পড়ে রাত কাটালেন—তারপর সে কি কষ্ট সমস্ত দিন ধরে—এসব কি তবে মিথ্যা !

হ্যাঁ, মিথ্যা—সে আমার স্ত্রী নয়—আমার স্ত্রী কখনো সন্ন্যাসিনী নয়—এই ঐশ্বর্য্য, এই বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত—এত কষ্ট কখনো সে সহ্য করতে পারে না—

আমি বললুম বলেন কি, ওই ছবি ত তাঁরই—তবে সঙ্গে আর একজন সন্ন্যাসী ছিল যাঁকে ভুলে আমি তাঁর স্বামী—

ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে তিনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, খবরদার ! তার স্বামী আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। মিথ্যা, মিথ্যা—এসব মিথ্যা ! বলতে বলতে হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হয়ে সেখানে পড়ে গেলেন।

ধড়াস্ করে একটা আওয়াজ হ'লো !

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে লোকজন চাকর-বাকর ছুটে এলো। কেউ তাঁর মাথায় জল দিতে লাগল, কেউ হাওয়া করতে লাগল, কেউ বা

ডাক্তার ডাকতে ছুটলো। ব্যাপার দেখে আমার গা-হাত-পা তখন থর থর করে কাঁপতে লাগল।

চাকররা বললে, আপনি কি ওঁর স্ত্রীর কথা তুলেছিলেন?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, হ্যাঁ—কেন বলতো?

চাকরগুলি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়লো। আমি যেন সেখানে একটা অপরাধী, অন্তত তারা সবাই আমার প্রতি সেই রকম ভাবে তাকাতে লাগল। আমি তখন সেস্থান পরিত্যাগ করতে পারলে যেন বাঁচি। তাই একটি চাকরকে ক্ষীণ-কণ্ঠে বললুম, আমি চলে যেতে চাই—যদি বাইরে পর্য্যন্ত আমায় এগিয়ে দাও।

চাকরটিও যেন আমায় সেখান থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে, এইভাবে বললে, চলুন।

তার পেছনে পেছনে আমি নামতে লাগলুম। সিঁড়িটা পার হ'য়ে এসে চাকরটা আমায় চুপি চুপি বললে, গিন্নিমাকে হারিয়েই ত বাবুর মাথাটা এ-রকম হয়ে গেছে। বড্ড ভালবাসতেন কিনা তাঁকে! এক মুহূর্ত্ত চোখে না দেখলে দিশেহারা হয়ে যেতেন। এমনি বেশ আছেন—কাজকর্ম্ম করছেন, লেখাপড়া করছেন—কিন্তু তাঁর কথা একবার তুলেছেন কি অমনি ক্ষেপে যাবেন! পুরুষ মানুষ যে মেয়েমানুষকে এত ভা বাসতে পারে এ আমি আগে কখনো দেখিনি!

চাকরটির মুখ থেকে এই কথা শুনে আমার ভারী রাগ হলো। একবার মনে হ'লো বলি, তুই ব্যাটা আস্ত ভূত তুই বুঝবি কি বাঙালী নরনারীর প্রেমের অর্থ। কিন্তু সে কথাটা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে প্রবৃত্তি হ'লো না যখন শুনলুম গিন্নীমা মারা গেছেন। তখন সেই ভদ্র-

লোকের সমস্ত আচরণ আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। আমাকে যে তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কটুকথা ও গালাগালি দিয়েছিলেন তার জন্য একটুও অপমানিত বোধ না করে বরং এই ভেবে গর্ব্ব অনুভব করতে লাগলুম যে এমন একটি প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হ'লো। সারা পথ আমি চাকরটির সঙ্গে আর কোন আলাপই করলুম না। একটা গভীর বেদনায় আমার সমস্ত অন্তর যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

গেট থেকে রাস্তায় পা দিতেই আমার সে চমক ভাঙ্গল। চাকরটি তখন সবে ফটকে চাবি বন্ধ করছে আমি হঠাৎ তার কাছে ফিরে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, কবে মারা গেছেন?

চাকরটি যেন আকাশ থেকে পড়লো। আমার মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিতকণ্ঠে বললে, মারা গেছেন? কে?

আমি বললুম, তোমাদের গিন্নিমা?

চাকরটি হিন্দুস্থানী এবং বয়সও হয়েছে [illegible] পঞ্চাশের ওপর। নিজের কপালে নিজে একটা চড় মেরে বললে, হা ভগবান মরতে যাবে কেন?

মরেনি! তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে আমি বললুম।

চাকরটি তখন কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নীচু ক'রে বললে, ভাগ গিয়া, দোসরা মরদ কো সাথ—

এঁ্যা, পালিয়ে গেছে, অন্য লোকের সঙ্গে? আমি চমকে উঠলুম। সামনে বজ্রাঘাত হ'লেও বোধ করি আমি এতটা বিস্মিত হতুম না। বুকের মধ্যে থেকে কি যেন একটা ঠেলে উঠে তখন আমার শ্বাসরোধ করতে লাগল।

সুদূরের পিয়াসী

সারাপথ হেঁটে যখন হোটেলে এসে পৌছলুম তখন রাত আটটা বেজে গেছে। কোন রকমে ছু'টি খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার চোখে ঘুম এলো না। ঘুরে ফিরে কেবলই আমার একটা কথা মনে হতে লাগল, এমন রূপবান, বলিষ্ঠ, বিদ্বান ও উপার্জ্জনক্ষম স্বামী এবং তাঁর প্রাণঢালা ভালবাসা পেয়েও যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে যায় সে কি চায়? এ সংসারে কি তার কাম্য?

পরদিন থেকে পাটনা শহর আমার কাছে এত বিশ্রী মনে হ'তে লাগল যে সেখানে আর একদণ্ডও আমার থাকতে ভাল লাগছিল না। সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর ব্যাপারটা তখন অতি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো আমার কাছে। এবং কেন যে তাদের কথা উল্লেখ করামাত্র সেই ভদ্রলোক ক্ষিপ্তের মত হয়ে উঠছিলেন তাও বুঝলুম। কিন্তু একটা কথা বুঝতে না পেরে আমারও মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তীর্থস্থানে এসে যারা মিথ্যা কথা বলে, দেবতাকে নিয়ে যারা ছেলেখেলা করে তারা কোন শ্রেণীর মানুষ!

পবিত্র দেহে শুদ্ধ চিত্তে আজও হিন্দুরা যে সব দেবদেবীর পূজা করে বেদ ও পুরাণের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে—তাদের অসম্মান করার সাহস যাদের আছে তাদের কথা চিন্তা করতেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি নিজে ধার্ম্মিক নই এবং ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দেবার মত বয়সও এখন আমার হয়নি তবুও কিন্তু দেবদেবীর মন্দিরের সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারি না। আমার শিরায় উপশিরায় অস্থিতে মজ্জাতে পিতা

পিতামহ ও পূর্ব্বপুরুষদের যে রক্তকণা আজও প্রবাহিত হচ্ছে তারা যেন চীৎকার করে আমার কানে কানে বলে, ওরে মূর্খ ভুলিসনে যে মানুষের চেয়েও বড় মানুষের এই ধর্ম্মবিশ্বাস—তাই যুগ যুগ কেটে গেছে—কত মানুষ এসেছে কত মানুষ চলে গেছে কিন্তু আজও সেই বিশ্বাস তেমনি আছে অবিনশ্বর হ'য়ে !

যাইহোক্, ভগবান যেন আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। সেইদিন অফিসে যেতেই হিন্দুস্থানী বড়বাবু আমায় কাজকর্ম্ম সব বুঝিয়ে দিলেন। এবং পরদিন সকাল থেকেই যাতে আমি কাজ শুরু করতে পারি তার বন্দোবস্ত করলেন।

ভাগ্যক্রমে সেইদিনই অপরাহ্নে বিছানা ও স্যুটকেশ নিয়ে আমি রওনা হ'লুম মজঃফরপুর। পাটনা আর তার সেই কদর্য্য স্মৃতি পড়ে রইল পিছনে। সে স্মৃতি যাতে একেবারেই ভুলে যেতে পারি, ষ্টীমার থেকে ক্রমবিলীয়মান বাঁকীপুর সহরের দিকে চেয়ে একান্তমনে সেই প্রার্থনাই করতে লাগলুম ভগবানের কাছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বহুদিন বেকার বসে থাকবার পর চাকরী পেয়ে আমার উৎসাহ যেন বেড়ে গেল—দ্বিগুণ উদ্যমে আমি কাজ করতে লাগলুম। দু'দিনের কাজ একদিনে করি, তিন দিনের পথ দেড় দিনে যাই—যেখানে গাড়ী নেই সে পথ হেঁটে মেরে দিই, আর যেখানে গাড়ী আছে সেখানে দিনরাত চলি। বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় বহুদিন বেকার বসে থেকে থেকে অলস ও মন্থর হয়ে গেছি—আমার মনটা যত সজীব, দেহটা তত নয়। তাই মনের ঠিক পেছনে পেছনে দেহ-রথকে ছোটাবার জন্য সারথির মত সতর্ক হ'য়ে অশ্ববল্গা ধরে বসে থাকি। উল্কার মত ছুটে চলি গ্রাম থেকে গ্রামে, দেশ থেকে দেশান্তরে। এইভাবে দু'মাসের মধ্যে আমি ছাপরা, মজঃফরপুর, মতিহারী, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরে প্রচুর অর্ডার সংগ্রহ ক'রে আবার পাটনায় ফিরে এলুম। কোম্পানীর লোকেরা প্রথম দু'মাসের কাজ দেখে আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হ'লেন। তারপর তাঁরা আমায় আদেশ করলেন কাশী যেতে।

কাশীর নাম শুনে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো! কত কাহিনী, কত ইতিহাস শুনেছি সেই স্থানের। বেদ পুরাণে যার উল্লেখ পাই পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম শহরটী দেখবার জন্যে তখন আমার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কত দেবতার চরণরেণু মিশে আছে এর ধূলিকণায়, কত রাজ্যের উত্থান-পতন, কত দর্পিতের দর্পনাশের স্মৃতি এর মাটীতে জমে পাথর হয়ে আছে কে জানে। মনে পড়লো হরিশ্চন্দ্র

ও বিশ্বামিত্রের কথা, মনে পড়লো অন্নপূর্ণার সংসার সাধের কথা— শিবের নূতন সৃষ্টি মর্ত্তের স্বর্গধাম, হিন্দুর শ্রেষ্ঠতীর্থ সেই বারাণসীর কথা। যেখানে ম'লে মানুষকে আর জন্মাতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে শিবলোক প্রাপ্তি ঘটে সেই স্থানটি কেমন দেখবার জন্য বড় আগ্রহ ছিল প্রাণে।

একবার এক পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলেম যে কাশীধাম আছে মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর! তাই তিনি বলেছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা, তাঁর ত্রিশূলের ওপর যে স্থানটি সকল মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমি তাঁকে বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করেছিলুম, তাহ'লে এই যে লোক অনবরত কাশীতে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে, স্মরণাতীত কাল থেকে— তা কেমন করে সম্ভব হয়?

তিনি বললেন, তা হয়। শিবের যে ত্রি-শূল অর্থাৎ তিনটি শূল—ও আর কিছু নয় সত্ত্ব, রজঃ, তম মানুষের এই তিনটী গুণ। এই তিনটি গুণের ওপরে গেলে অর্থাৎ ত্রি-গুণাতীত হ'লে মানুষ যথার্থ কাশীধামে যায়—শিবলোক প্রাপ্ত হয়। কথাটার আধ্যাত্মিক অর্থ আমার বেশ ভাল লেগেছিল। শ্রদ্ধায় সেই পণ্ডিতের পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিয়েছিলুম। সে কথাটিও সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়লো। আমি যুবক—সত্ত্ব, রজঃ, তম আমার অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত বিরাজ করছে— যথার্থ কাশীধামে পৌছানো আমার হবে কিনা জানি না, তবে যে তীর্থে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ গেছেন সেই তীর্থে অন্তত আমার দেহ-ত পৌছক্—এই হ'লো আমার আগ্রহ! তাকেও না আবার কালভৈরব তাড়িয়ে দেন!

সুদূরের পিয়াসী

পরদিন ভোরে হঠাৎ যখন গাড়ীর বেগ কমে গেল এবং ধীরে ধীরে ট্রেণ 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজের' ওপর উঠতে লাগল, যাত্রীদের চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল! 'বিশ্বনাথ জী কি জয়' 'গঙ্গামায়ি কী জয়' বলে ঝন্ ঝন্ করে তারা পয়সা ফেলে দিতে লাগল গঙ্গায়! আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে উঠে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো এই পয়সা জলে ফেলে দেওয়ার অর্থ কি? অত্যন্ত অনুকম্পা-ভরে তখন সেই অশিক্ষিত যাত্রীদের দিকে তাকালুম কিন্তু পকেটের পয়সা পকেটেই আবার রেখে দিতে যাচ্ছি এমন সময় আমার দৃষ্টি পড়লো বাইরের দিকে। তখন গঙ্গার ওপর সবে ভোর হচ্ছে। তাই দেখে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার দেহ।

কি মহান্ সে দৃশ্য! শান্ত নিস্তরঙ্গ গঙ্গা তাঁর স্বচ্ছ নীল জলধারা দিয়ে বেষ্টন করে আছেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে অসংখ্য অট্টালিকা মন্দিরচূড়া ও গগনস্পর্শী মিনার শোভিত অনুচ্চ একখণ্ড পাহাড়কে। ভোরের আলো-আঁধারে তা অস্পষ্ট। মনে হলো, যেন কোন তপস্বিনী রমণী তপোভঙ্গের পর প্রণাম করছে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে—তার তপশীর্ণ দেহ, পরণে নীলাম্বরী সাড়ী—আর মহাদেবের ধ্যান-স্তিমিত নেত্র, ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ প্রসন্ন হাসি—ভক্তিমতীর তপস্যায় যেন তিনি তুষ্ট হয়েছেন। পকেটে যা ছিল, একমুঠো পয়সা সিকি দুয়ানি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম গঙ্গায়। মনে হলো এই ত পরীক্ষা। দেবতার উদ্দেশ্য এই যে সামান্য ত্যাগ, এই থেকেই মানুষ একদিন শিক্ষালাভ করবে বৃহত্তর ত্যাগের। ভগবানের জন্য, তাঁর ভক্তের জন্য, তাঁর সৃষ্ট সর্ব্বজীবের জন্য তবে লোক সর্ব্বস্বদান করতে পারবে। নমস্কার করলুম, 'জয় বিশ্বনাথ' বলে।

পুল পেরিয়ে রাজঘাট স্টেসনে গিয়ে গাড়ী থামল। এইখানে নেমেও

কাশীতে যাওয়া যায় কিন্তু বড্ড দূর হয়। তাই এর পরের স্টেসন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে নামলুম—সকলেই এখান থেকে যায়।

যাত্রীদের ভীড়ে প্ল্যাটফর্ম্ম ভরে উঠেছে। টিকিট দিয়ে গেট পার হয়ে পুল থেকে নামতেই এক্কাওলা, টাঙ্গাওলার টানাটানি শুরু হ'লো। দু' আনা থেকে দর কসতে কসতে দশ পয়সায় একখানা এক্কা ভাড়া করে রওনা হ'লুম।

ছোট এক্কা, নিস্তেজ ঘোড়া নিয়ে ঠুকঠুক্ ক'রে চললো। স্টেসন থেকে শহর পুরো দু'মাইল। একটা কি দুটো মোড় পেরিয়েছি এমন সময় হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে একজন সরকারী লোক 'চুঙ্গী' আদায় করতে এলো। 'চুঙ্গী' হ'লো মিউনিসিপাল ট্যাক্স; ওদেশে ব্যবসায়ের জিনিষপত্রের ওপর ধার্য্য হয়। কিন্তু আমার কাছে সে রকম কোন জিনিষ না থাকায় তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে এক্কা নিয়ে গিয়ে আমায় ধর্ম্মশালায় তুললে। বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্ম্মশালা। বিরাট তিন মহল বাড়ী, তিনতালা—অতি-আধুনিক ধরণের কারুকার্য্য শোভিত। সামনেই দু'খানা বড় বড় ফোটো বাঁধানো। একখানা প্রতিষ্ঠাতার, আর একখানা তাঁর পিতার—যাঁর নামে এই ধর্ম্মশালার নামকরণ হয়েছে। দৈনিক চার আনা ভাড়ায় একখানি ছোট্ট ঘর আমি পেলুম। ধর্ম্মশালায় বিনা পয়সায় থাকতে দেওয়া যদিও নিয়ম কিন্তু এঁরা আলোর খরচা বাবদ এই ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা করে এঁরা ভালই করেছেন—সাধারণ যাত্রীদের যথেচ্ছ নোংরামির হাত থেকে বাঁচা গেছে। ফলে যেখানে সেখানে পানের পিক্, শোবার ঘরের দেওয়ালে থুতু গয়ারের দাগ নেই—চারিদিক ধোওয়া-মোছা ঝক্‌ঝক তক্‌তক্ করছে।

প্রথমে জুতো জামা খুলে খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নিলুম। তারপর তক্তপোষের ওপর বিছানাটা বিছিয়ে জিনিষ-পত্র সব গোজগাছ ক'রে রেখে গঙ্গাস্নানে যাবার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলুম। তোয়ালেটা বার করে, নতুন একটা তেলের শিশির ছিপি খুলে মাথায় তেল মাখছি এমন সময় আমারই প্রায় সমবয়সী একটি যুবক হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে, বা ফার্স্ট ক্লাশ গন্ধ ত, কি তেল মাখছেন দাদা? দেখি একটু দিন ত। এই বলে একেবারে আমার সামনে এসে হাত পাতলে।

এই রকম দ্বিধাসঙ্কোচহীন উক্তি আমার তখন ভারী ভাল লাগল। তাই তাড়াতাড়ি তার হাতে তেল ঢেলে দিতে দিতে বললুম, নিশ্চয়ই দেবো।

থাক্ থাক্ আর দিতে হবে না—এই বলে মাথায় তেল মাখতে মাখতে সেই যুবকটি বললে, গঙ্গাস্নানে যাবেন বুঝি?

আমি বললুম, হ্যাঁ। আচ্ছা এখান থেকে গঙ্গার ঘাট কতদূর?

সে বললে, ও আপনি বুঝি এই প্রথম আসছেন। আচ্ছা চলুন আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি গঙ্গায়। কলের জলে আমি অবশ্য রোজ স্নান করি। তবে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে করতে যাওয়া যাবে। ভালই হ'লো।

এই হ'লো আমাদের আলাপের স্ত্রপাত। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে পৌছবার আগেই আমরা উভয়ে উভয়ের সমস্ত পরিচয় জেনে ফেললুম। সে আমার পাশের ঘরে থাকে, আমারই মত ব্যবসা করতে এসেছে সেখানে। পুস্তক ব্যবসায়ী, বাড়ী কলকাতার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে। তবে পরের চাকরী করে না। নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে। বাংলা বই কিনে নিয়ে সে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। দিল্লী লাহোর থেকে

শুরু করে ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করেছে। ব্যবসার লাভ-লোকসানের চেয়ে দেশ-ভ্রমণই তার কাছে বড় আনন্দ। একদেশে গিয়ে যেমন যে ব্যবসায় লাভ করে, অন্যদেশে গিয়ে তেমনি তা খরচ করে। ফি বছরে একবার করে এই দিকে আসে। এখানকার পথঘাট এখন সব তার পরিচিত হয়ে গেছে।

গঙ্গার ঘাট দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলুম। অগণিত ধাপ নেমে গেছে একেবারে জলের ভিতরে—বড় বড় চওড়া চওড়া পাথরের সিঁড়ি, মধ্যে মধ্যে বিরাট চাতাল এবং ঘাটের ওপর পাঁচতালা-ছ'তালা উঁচু বাড়ীর শ্রেণী! জলের কাছাকাছি চাতালের ওপর পাণ্ডাদের আস্তানা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁখারি ও দরমার তৈরি ছাতি, তারি মধ্যে বসে আছে পাণ্ডারা, আয়না চিরুণী তেল চন্দন নিয়ে। স্নানার্থীরা তাদের কাছে কাপড় জামা রেখে জলে নামে এবং স্নান শেষ হয়ে গেলে তাদের আয়না চিরুণী নিয়ে চুল আঁচড়ে একটা তুটো পয়সা তাদের দিয়ে চলে যায়। পাণ্ডারা একটা করে চন্দনের টিকা কপালে পরিয়ে দিয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করে। সামান্যতেই তারা খুসী। বেশীর লোভে যাত্রীদের বিরক্ত করে না।

এমনি একজনের কাছে কাপড় চোপড় রেখে আমরা স্নান করতে নামলুম। কিন্তু জলে নামবার আগে সে আমায় বললে, আরে বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে—দাঁড়ান একটা সঙ্কল্প ক'রে তবে আপনার ডুব দেওয়া উচিত। এত বড় একটা মহাতীর্থে যখন এসেছেন তখন পুণ্যিটুকুই বা ছাড়বেন কেন? এই বলে সেই পাণ্ডা ঠাকুরকে ডেকে এনে আমায় মন্ত্র পড়িয়ে সে সঙ্কল্প করিয়ে দিলে। আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না। আমার চারিপাশে স্নানার্থী নরনারীর ভক্তিগদগদ মূর্ত্তি দেখে তখন আমিও যেন মনে মনে চলে গিয়েছিলুম সেই বহু প্রাচীনকালে যখন পশ্চিমের শিক্ষার স্রোত

নৰ্দ্দমার জলের মত এসে আমাদের সনাতন ধৰ্ম্মবিশ্বাসকে কলুষিত করেনি একেবারে !

তারপর চললুম বিশ্বনাথ দর্শনে। বহু খাবারের দোকান, দুধ দৈ রাবড়ী মালাইয়ের দোকান, পুতুল ও বাসনের দোকান, কাপড় ছবি অলঙ্কার দেবমূৰ্ত্তি প্রভৃতির অসংখ্য দোকান ছেড়ে, গলির মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা চললুম। এত সরু গলির মধ্যে যে এত অট্টালিকা থাকতে পারে তা আমি চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাসই করতুম না। আশ্চর্য্য ! দু'জন হিন্দুস্থানী লোককে সেইপথে একসঙ্গে যেতে রীতিমত কষ্ট করতে হয়, তার ওপর আবার কাশীর বিখ্যাত ষাঁড়—খেয়াল্ খুশী মত যেখানে সেখানে পথ জোড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠেলেঠুলে কোন রকমে আমরা ঢুণ্ডিরাজ গণেশের কাছে গিয়ে পৌছলুম। আগে ঢুণ্ডিরাজের পূজো না দিলে কাশীতে কোন দেবতার পূজোই নাকি সিদ্ধ হয় না। তাই সেই বিরাট সিঁদুর-মাখা ভুঁড়িওলা গণেশের মাথায় আগে ফুল বিল্বপত্র চড়িয়ে, তারপর্ গেলুম বিশ্বনাথ দর্শনে।

প্রকাণ্ড রূপোর দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে ছোট্ট একটি মন্দির দেখে মনটা আমার কেমন হ'য়ে গেল। তবে উপরের দিকে সুবর্ণমণ্ডিত চুড়ার দিকে চেয়ে একটু সান্ত্বনা পেলুম। ভার না থাক্—ধার আছে। যাইহোক্ মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পাণ্ডা ঠাকুরের হাতে পুজোর সন্দেশ ও ফুলবিল্বপত্র আগে দিয়ে দিলুম। তিনি নিবেদন করে সমস্তটাই আবার আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। এসবে এঁদের লোভ নেই। তখন আমার সঙ্গীটি আমায় বললে, নিন স্পর্শ করুন। সবাই দেখলুম হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেবতাকে স্পর্শ করে তাঁর চরণামৃত পান করছে। আমি ভীড় ঠেলে তার মধ্যে ঢুকলুম। কিন্তু বিগ্রহ কৈ ? ফুলবেলপাতা গঙ্গাজলে তিনি তখন

ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন গহ্বরের মধ্যে। জলের মধ্যে হাত ডুবোতেই একেবারে তাঁর মাথায় আমার হাত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। আমি তীর্থ করতে আসিনি এবং পুণ্যকর্ম্মের প্রতি লোভও নেই, তবুও মনে হলো যেন, একি করলুম! কাকে স্পর্শ করলুম? কাশী বিশ্বনাথ! যিনি ত্রিলোকেশ্বর—যিনি সকল দেবদেবীর পূজ্য, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা—যুগ যুগ ধরে যাঁর দর্শন পাবার জন্য লোক কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে! থর থর করে আমার হাত কাঁপতে লাগল। কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে এলো। মনে মনে বললুম, হে সর্ব্বজ্ঞ, তুমি আমায় ক্ষমা করো—হে নীলকণ্ঠ! তুমি আমার সমস্ত পাপ মোচন করো।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা অন্নপূর্ণার মন্দিরে ঢুকলুম। পাথরের দেবীমূর্ত্তি, সোনার মুখ পরানো। নমস্কার করে পূজা দিলুম। সঙ্গী বললে, এই অন্নপূর্ণা দর্শন করলে আর জীবনে কখনো অন্নকষ্ট হয় না। মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে আবার ভাল করে দর্শন করলুম এবং নিজের হাতে বিগ্রহকে স্পর্শ ক'রে ধর্ম্মশালায় ফিরে গেলুম।

বিরাট শহর এই কাশী! হাজার হাজার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গলি এর সৌন্দর্য্য! এই অসূর্য্যম্পশ্যা গলিগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে—ঠাসাঠাসি বাড়ী চারিদিকে—একটার সঙ্গে আর একটা এমন ভাবে সংযুক্ত হ'য়ে আছে যে দূর থেকে যেন মনে হয় কতকগুলি রেখার একটা হিজি-বিজি! এরই মধ্যে বড় বড় ধনীর অট্টালিকা—এরি মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসার কেন্দ্র—এরই মধ্যে অসংখ্য টোল, ছাত্রাবাস—বিদ্যাদিগ্‌গজ, তর্কচঞ্চু, ন্যায়রত্ন, শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রচর্চ্চা—

এরই মধ্যে বড় ছোট হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির। এই গলিগুলি কাশীর গৌরব-স্মৃতির বহু প্রাচীন ইতিহাস বক্ষে ক'রে আজো দাঁড়িয়ে আছে অম্লান জ্যোতিতে। কত সহস্র বৎসরের কত কথা কত ঘটনা আজো তার গঙ্গার ঘাটের সেই অসংখ্য সোপনাবলীতে নীরবে পাষাণ হয়ে আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দু'জনে একটা নৌকা ক'রে প্রত্যহ কেদারঘাট থেকে মণিকর্ণিকাঘাট পর্য্যন্ত ভ্রমণ করতুম। মাথার উপরে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপুঞ্জশোভিত কালো আকাশ জলের মধ্যে নিজের ছায়ার দিকে স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকত—আর দূর থেকে ভেসে আসতো সানাইয়ের সুরে পূরবী ও বেহাগ রাগিনীর মৃদু আলাপ। আমি বিস্মিত হয়ে সেই আলোছায়া-মেশানো ঘাটের সেই অদ্ভুত দীর্ঘ সোপানাবলীর দিকে চেয়ে থাকতুম! আমার মনে হ'তো যেন কোন রহস্যপুরীর মধ্যে থেকে এই ঘাটগুলির সোপানশ্রেণী নেমে এসেছে। তাদের কোন আদি নেই অন্ত নেই—কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় যে চলে গেছে কে জানে।

ওপরের দিকে চাইলে দেখি কোথাও একটা ঝাঁকড়া প্রাচীন বট, তারপাশে হয়ত তদধিক প্রাচীন এক মন্দির! টিপটিপ করে একটা আলো জ্বলছে, দূরে একেবারে ঘাটের মাথায়—খানিকটা আলো, খানিকটা ছায়া মিশে ঘাটের ওপর এক অজানা রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। আর নীচে অন্ধকার জলের দিকে চাইলে মনে হয় যেন ঘাটের কানে কানে যেন গঙ্গা অস্পষ্ট কলকলে কি সব কথা বলছে। আমি চুপি চুপি পেছন থেকে তাদের এই কথা শোনবার জন্যে নিশব্দে কান পেতে থাকতুম।

কাশীতে আমি দশবারোদিন ছিলুম। ইতিমধ্যে সেই যুবকটির সঙ্গে

সুদূরের পিয়াসী

আমার এমন বন্ধুত্ব জমে উঠলো যে সদাসর্ব্বদা আমরা একসঙ্গে থাকতুম। শুধু দুপুরের সময়টা নিজেদের কাজকর্ম্ম করবার জন্য ঘণ্টা চার-পাঁচেক আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তো।

যুবকটির নাম অরুণ, বয়স বছর কুড়ি বাইশ। ভারী কল্পনাপ্রবণ অথচ আবার ছেলেমানুষের মতন সরল! এই কদিনেই সে তার জীবনের ইতিহাস প্রায় সবটুকুই ব্যক্ত ক'রে দিয়েছিলে আমার কাছে। আর যেটুকু বাকী ছিল তাও ফিরে আসবার আগের দিন রাত্রে আমায় বলে ফেললে।

সেদিন রাসপূর্ণিমা। রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে গেছে। তখনো আমরা নৌকো নিয়ে গঙ্গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। গঙ্গার বুকে তখন আর কোন নৌকো ছিল না—সবই ঘাটে বাঁধা—মাঝিরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে। মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন চাঁদের আলোয় ধুয়ে গেছে। দূর থেকে শুধু সানাইয়ের করুণ সুর ভেসে আসছিল। আমি সঙ্গীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, যেন কিসের স্বপ্ন তার চোখে! বললুম, অরুণ আর নয়. অনেক রাত হ'য়ে গেল, চলো ফিরে যাই এবারে।

অরুণ আমার হাতটা ধীরে ধীরে তার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু-কণ্ঠে বললে, দাদা, তুমি কি কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবেসেছ ?

আমি বললুম, না, আমি যাকে ভালবাসতে পারি এরকম মেয়ে এ পর্য্যন্ত পাইনি। তুমি কি ভালবেসেছ কাউকে ?

অরুণ তার স্বপ্নালস চোখ দুটি আমার চোখের ওপর মেলে দিয়ে বললে, আমি ত বেসেছি কিন্তু সে বেসেছে কিনা জানি না।

আমি বললুম, সে আবার কি ?

সে এক অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু আমি মুখে তা বলতে পারবো না।

এই বলে পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বার করে সে সলজ্জ-ভাবে আমার হাতে দিলে। বললুম, এ যে দেখছি রীতিমত একটা উপন্যাস !

মৃদুকণ্ঠে অরুণ বললে, না, এ শুধু একটা ছোট গল্প। আজই লিখেছি। আজ রাসপূর্ণিমা কি না ! সেদিনও এই তিথি ছিল ! এই বলে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিলে !

আমি বললুম, লেখাটেখাও কি তোমার অভ্যাস আছে দেখছি ? তুমি সাহিত্যিক না কি ?

সে বললে, সাহিত্যিক হতে ইচ্ছা করে। তা'হলে হয়ত আমার জীবনের কথা কত সুন্দর ভাবে লিখতে পারতুম—এই আমার প্রথম লেখা। কেমন হয়েছে পড়ে দেখুন ত ?

কৌতূহল দমন করতে পারলুম না। মাঝির কাছ থেকে একটা আলো চেয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলুম ! অরুণ চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। অরুণ যেমন লিখেছিল হুবহু এখানে তা লিপিবদ্ধ করলুম। গল্পটা এই—

রাইপুরের চৌধুরীদের বাড়ী রাসযাত্রা। সাতখানা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে তাই দেখতে। বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী, ইতর ভদ্র—সকল শ্রেণীর লোকই আনন্দে মগ্ন !

তিনখানা মাঠ জুড়ে মেলা বসেছে। হোগলা ও বাখারীর ঘর পড়েছে সারি সারি, মুড়ি, বাতাসা ও তেলেভাজার দোকান একদিকে, হাঁড়ি কলসী, কুলো ধুচুনির দোকান অন্যদিকে,—কাপড়ের ছেঁড়া তাঁবু ফেলে এক পাশে ম্যাজিক ও সার্কাসের দল ঢাক বাজিয়ে মুখের মধ্যে জলন্ত আগুন পূরে দর্শকের মন ভোলাতে চেষ্টা করছে। একপাশে নাগরদোলা—

ছেলেমেয়েদের ভীড় সেখানে বেশী, কোথাও বা পুতুলনাচ, কৃষ্ণযাত্রা চলেছে। 'পেট্রোম্যাক্স' ও 'এ্যাসিটেলিন্' গ্যাসের আলোয়, সমবেত জনতার কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠেছে সেই পল্লীভূমি!

জমিদার বাড়ী তিন মহল! দোতালায় সারি সারি ঘর! ওপর-নীচেয় অগণিত সরু ও মোটা থাম প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন বুকে নিয়ে আজও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে।

বহির্মহলে মন্দির ও ঠাকুরদালান, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সেখানে প্রতিষ্ঠিত! একশত বৎসর ধরে নিত্য পূজা অর্চ্চনা হয়ে আস্‌ছে। বর্ত্তমান জমিদার কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরীর প্রপিতামহ এই কুলদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে বংশ-গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। সেই থেকে এই রাসযাত্রা চলে আসছে প্রতি বৎসর, মহাসমারোহে। পনেরদিন ধরে ফুরোয় না তার উৎসব—তার আনন্দ!

আজ রাসপূর্ণিমা! ভোর থেকে তাই চলেছে তার উদ্যোগ। জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলে মেয়েদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। পূজার কত আয়োজন, কত উপকরণ, কত নৈবেদ্য!

স্নান ক'রে ভিজে চুল পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে লাল পাড় গরদের শাড়ী পরে ভাঁড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন মালতীদেবী—কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরীর নববিবাহিতা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—চৌধুরী বংশের কুললক্ষ্মী।

তাঁর জীবনে রাসযাত্রা এই প্রথম। তাই বৃদ্ধা পিস্‌শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস ক'রে একটি একটি করে তিনি নিজের হাতে রাধাগোবিন্দের নৈবেদ্য সাজাতে লাগলেন। স্বামীর ও শ্বশুরকুলের গৃহদেবতাকে প্রীত করবার ভার এই প্রথম পড়েছে তাঁর ওপর। অতি শুদ্ধাচারে আজ সমস্ত দিন তিনি উপবাস ক'রে আছেন, রাসের পূজার্চ্চনা শেষ হ'লে তবে প্রসাদ

মুখে দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করবেন। প্রভাতের প্রস্ফুটিত কমলের মত একটি শুচিশ্রী তাঁর সর্ব্বাঙ্গে।

মালতীর বয়স অল্প হলেও জ্ঞান বুদ্ধি অল্প নয়, পূজার প্রতিটি নিয়ম-কানুন তাঁর কণ্ঠস্থ। তাই একটু একটু করে অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে মালতী তাঁর পরমপ্রিয়, প্রিয়তমের পূজার আয়োজন করতে লাগলেন। আজকের এই পূজাকে, এই উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার কাজ যে তাঁরই ওপর নির্ভর করছে! কোথাও যেন কোন দোষ ত্রুটী না ঘটে!

পুরোহিত মশায় তাঁর প্রাপ্য অর্থাৎ নৈবেদ্যাদিতে জিনিষপত্রের ষোল আনা পড়ছে কিনা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে অন্দর-মহলে গিয়ে তদারক করছিলেন। কি জানি, নূতন বৌ যদি কমটম দেয়। কিন্তু যখন দেখলেন, মালতী দেবী ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনার ব্যবস্থা করছেন, তখন অত্যন্ত খুশী হ'য়ে পিসিমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, হ্যাঁ মা! এবার তোমার বৌ আনা সার্থক হয়েছে। যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী। দেবদ্বিজে কি ভক্তি, কি শ্রদ্ধা! এই বৌয়ের কল্যাণে চৌধুরী বংশের ধনদৌলত আবার উথলে উঠবে। তুমি দেখে নিও মা, আমার মুখের কথা, ব্রাহ্মণের বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না।

পিসিমা বঁটিতে আক ছাড়াচ্ছিলেন। মালতীদেবীর সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বিতীয় বারের বিবাহ তিনিই দিয়েছিলেন জোর ক'রে। তাই পুরোহিত মশায়ের কথা শুনে হাসিতে, গর্ব্বে তাঁর দন্তহীন মুখে এমন একটা অদ্ভুত রূপ ফুটে উঠলো যে তাই দেখে উপস্থিত কুমারী মেয়েরা হাসি সামলাতে পারলে না। ফিস্‌ফিস্ করে সঙ্গিনীদের কানে কানে কি বলতে বলতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো।

সুদূরের পিয়াসী

মুখখানা বিকৃত ক'রে পিসিমা বললেন, আ-মর্ ছুঁড়িরা! একবারে হেসে গড়িয়ে পড়লো—যা এখান থেকে সরে, এখুনি মুখ থেকে থুথু পড়বে।

খিল খিল করে হাসতে হাসতে তারা সেখান থেকে ছুটে পালালো।

—কেষ্টো, ও কেষ্টো, বলি শুনে যা তো বাবা একবার এখানে।

কেষ্টো, ওরফে কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী তখন ব্যস্ত হয়ে বাইরের বারান্দা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। পিসিমার ডাক শুনেই তিনি ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।—কি পিসিমা?

পিসিমা শুরু করলেন—বলি এমন মেয়ে ঘরে আনিনি—চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে, শোন একবার পুরুতঠাকুর কি বলছেন।

পুরোহিত মশায় তখন রূপোর হুঁকোয় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, বাস্তবিক বাবা, বললে বিশ্বাস করবে না, আমার মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং রাধারাণী আবার ফিরে এসেছেন তাঁর কৃষ্ণের সেবা করবার জন্যে। আহা, মায়ের আমার কি ভক্তি, কি শ্রদ্ধা!

পিসিমা পুরোহিত মশায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, হবে না? আমি কি যে-সে ঘরের মেয়ে এনেছি? কেষ্টো আমার কিছুতেই বিয়ে করবে না—বলে পিসিমা, আমার চল্লিশ বছর বয়স, তোমার ষোল বছরের ক নে কি আমায় পছন্দ করবে?

কৃষ্ণনারায়ণ আর সে কথা শুনতে পারলেন না। ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্যত্র প্রস্থান করলেন। গর্ব্বমিশ্রিত একপ্রকার চাপা হাসিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু পিসিমা তখনো থামলেন না। বেমার এই সুখ্যাতির সবটুকু গে রব যে তাঁর প্রাপ্য তাই প্রমাণ করবার জন্য আবার বলতে আরম্ভ

করলেন, আমি বলি পুরুষমানুষের আবার বয়স কি? কত জন্মের পুণ্যি থাকলে তবে এই ঘরে মেয়ে পড়ে। কি বলুন পুরুত মশায়?

ঠিক ঠিক। বলে তিনি আবার হুঁকোয় মনোযোগ দিলেন।

সন্ধ্যা হল। ঘরে ঘরে আলো জ্বললো।

অন্দর ও বহির্মহল সুশোভিত হয়ে উঠলো আলোক-মালায়। হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন জ্বললো ঠাকুর-দালানে। ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে, পুষ্প-চন্দন ও ধূপ ধুনোর গন্ধে মেতে উঠলো পূজামণ্ডপ। পুরুত মশায় উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন।

বাইরে অগণিত দর্শনার্থী। ঠাকুর-দালানের মধ্যে অন্তঃপুরিকাদের ভীড়। পিসিমা, মাসিমা প্রভৃতি বিধবারা বিগ্রহের দিকে চেয়ে বসে বসে কর জপছেন, তাঁদের দু:চোখে গড়িয়ে পড়ছে প্রেমাশ্রু। খালি গায়ে, গরদ পরে ভক্তি-গদগদ-চিত্তে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন জমিদার কৃষ্ণ-নারায়ণ চৌধুরী—তাঁর দৃষ্টি সেই কুলদেবতার দুখানি রাঙ্গা চরণের ওপর নিবদ্ধ।

পিসিমা মালা জপতে জপতে এদিক ওদিক চেয়ে অনুচ্চকণ্ঠে পার্শ্ববর্ত্তিনীকে বললেন, শীগগির বৌমাকে ডেকে আন, পূজো যে আরম্ভ হলো।

পার্শ্ববর্ত্তিনী সম্পর্কে বধূমাতার অর্থাৎ মালতীর ননদ হ'ন। তাই তিনি তাঁর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, ওখনো যে তার 'ভাবন' হয়নি গো।

এমন সময় সেখানে এসে ঢুকলেন মালতীদেবী। তাঁর সারা দেহে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! পরণে দুগ্ধশুভ্র গরদের শাড়ী, অলক্তকরঞ্জিত

চরণযুগল, অপ্রশস্ত ললাটে চন্দনের একটি ছোট টিপ, ভ্রমরকৃষ্ণ আয়ত দু'টি চক্ষে ভাববিহ্বলতা। কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজে চামরটি হাতে তুলে নিলেন এবং সেই পুষ্পশোভিত রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তিকে ব্যজন করতে লাগলেন।

পিসিমা আড়চোখে একবার বধূর দিকে চেয়ে আবার ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন।

কৃষ্ণনারায়ণ তখন নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর এমন অপূর্ব্ব রূপ তিনি ইতিপূর্ব্বে যেন কখনো দেখেন নি। এ রূপ এতদিন মালতীদেবী কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? এ যেন রূপ ও রসের মহামিলন। সৌন্দর্য্যের সাগরে উঠেছে আনন্দের তুফান। কৃষ্ণ-নারায়ণের চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিকে তিনি কিছুতেই কিন্তু ধ্যানের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করতে পারলেন না, সে মূর্ত্তি মানবীরই!

পূজা ও আরতি শেষ হলো।

পিসিমা এবং কৃষ্ণনারায়ণ দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মালতী দেবীকে জল খাওয়াবার জন্য। রেকাবে ফলমূল ও খাবার সাজিয়ে পিসিমা বললেন, বোমা খাবে এসো ত মা, কত রাত হয়ে গেল। আহা সমস্ত দিন উপোস করে বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

মালতী দেবী বললেন, পিসিমা আজ উৎসবের দিন সকল প্রজাকে আমি নিজে হাতে খাইয়ে তবে আমি জল খাবো, তা না হলে আমার ব্রত যে পূর্ণ হবে না।

ওমা, এতটুকু মেয়ে বলে কি! পিসিমা তাড়াতাড়ি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ও কথা বলতে নেই মা, তুমি চৌধুরীবংশের

কুলবধূ, এতগুলো বাইরের লোকের সামনে বেরুলে যে লোকে আমাদের নিন্দে করবে আর আমাদেরও সকলের তাতে মাথা হেঁট হবে। চৌধুরী-বংশের কুলপ্রথা কি ভঙ্গ করতে আছে মা ?

মালতী দেবী তখন ছেলেমানুষের মত জেদ ধরলেন।

পিসিমা তাঁর কথার কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-নারায়ণ পিছন থেকে এসে বললেন, অসম্ভব, তা হ'তে পারে না—তুমি চৌধুরী বংশের নামে কালি দেবে নাকি ?

স্বামীর কথার ওপর তিনি আর কোন কথা বল্‌তে পারলেন না। তাঁর মন মুসড়ে গেল।

অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে হ'তে প্রায় রাত্রি একটা বাজলো।

তারপর শুরু হলো যাত্রা, 'রাবণ-বধ'। কলকাতার নামকরা দল। সাতখানা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে তাই শুনতে। লোকে লোকারণ্য! ঘরে দোরে, বারাণ্ডায় উঠোনে, ওপরে নীচে, লোক আর ধরে না।

পিসিমা বললেন, চলো বৌমা তুমি আমার কাছে বসবে।

মালতী দেবী বললেন, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, ওই ভীড়ের মধ্যে যাবো না পিসিমা।

—ওমা, এ যে কলকাতার নাম-করা দল বাছা, একবার দেখবে না কেমন 'এক্‌টো' করে ?

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনারায়ণ বলে উঠলেন, থাক থাক পিসিমা, আর রাত জাগতে হবে না, সমস্ত দিন উপোসের পর ঘুমলে শরীর সুস্থ হবে'খন।

এই বলে তিনি চলে গেলেন যাত্রার আসরে। আর পিসিমা বৌমাকে

বিছানায় শুইয়ে চলে গেলেন চীকের আড়ালে এবং সবাইকে ঠেলে ভীড়ের মধ্যে নিজের জায়গা ক'রে নিলেন।

ঘুম! আজ ঘুম নেই মালতী দেবীর চোখে। আজকের রাত—রাসপূর্ণিমার রাত কি ঘুমিয়ে কাটাবার? তাই তিনি শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন এবং খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

বাড়ীর সঙ্গে পাঁচিল ঘেরা বিরাট বাগান। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড দীঘি, তার চারিধারে শ্বেত পাথরের ঘাট। তাতে কত ফুল গাছ, কত ফলের বন, কত বকুল মাধবী লতার কুঞ্জ। হেমন্তের মেঘহীন স্নিগ্ধ আকাশ থেকে জ্যোৎস্না যেন শতধারে ঝরে পড়ছে গাছের মাথায়, ফুলের পাপ্‌ড়িতে, দীঘির কালো জলে।

মালতী দেবীর চোখের সামনে 'বহু যুগের ওপার থেকে' ভেসে এলো এই রাসপূর্ণিমা রাতের স্মৃতি। সেদিনও ছিল আকাশে বনে এমনি আলোছায়ার অপরূপ মায়া। বৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জে দীর্ঘ রজনীব্যাপী কৃষ্ণ রাধিকা কত লীলা খেলা করেছিলেন।

একি বৌদি, তুমি এখনো ঘুমোওনি? এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই বলতে বলতে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামল।

চম্‌কে উঠে অল্প একটু কাপড় মাথায় টেনে দিয়ে হাসতে হাসতে মালতী দেবী বললেন, যা তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের গলা—রাবণকে আর কষ্ট করে বোধহয় সীতা দেবীকে হরণ করতে হয়নি, স্বামী ও দেওরের হুঙ্কার শুনে বেচারী নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে—কি বল ঠাকুরপো?

সুদূরের পিয়াসী

বৌদির কথা শুনে শ্যামল হেসে উঠলো এবং বললে, একবার নিজে গিয়ে দেখবে চলোনা বৌদি !

মাপ কর ভাই, আমি বেশ আছি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছি—কি সুন্দর ওই পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখ দেখি—কখনো দোল খাচ্ছে দীঘির জলে, কখনো লুকোচুরি খেলছে ফুলের সঙ্গে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে।

শ্যামল তরুণ যুবক। ছিপছিপে কালো চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, টানা দুই ডাগর চোখে কোন্ সুদূরের স্বপ্ন! সে বললে, সত্যি বৌদি, কি সুন্দর আজকের প্রকৃতি! লতায় পাতায় আকাশে বাতাসে কি মধুর সৌন্দর্য্য! এই বলে সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর মালতী দেবী ধীরে ধীরে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার যাত্রা যে শেষ হয়ে গেল, যাও শীগ্‌গির ?

না বৌদি, যাত্রা আর আমি শুনবো না, প্রতিটী লোকের ওই এক-ঘেয়ে জঘন্য চীৎকার শুনে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই এখানে পালিয়ে এসেছি।

—তোমার দেখছি রসবোধ আছে! এই বলে মালতী দেবী একটু মুখ টিপে হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে শ্যামলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্তব্ধভাবে আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। দুজনের কারো মুখে কোন কথা ফুটল না। তারপর ধীরে ও মৃদুকণ্ঠে মালতী দেবী বললেন, ঠাকুরপো, চলো না বাগানে যাই। রাত্তির ত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো; তুমি ফুল তুলে এনে আমায় দেবে, আর আমি ঘাটে বসে আমার রাধাকৃষ্ণের জন্যে মালা গাঁথবো !

উৎসাহে শ্যামলের মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে বললে, তাই চলো বৌদি।

শ্যামল আগে আগে চলতে লাগল আর তার পেছনে যেতে লাগলেন মালতী দেবী সুসজ্জিত বেশে।

খিড়কির দরজা পেরিয়ে বাগানের লাল কাঁকর দেওয়া পথ ধরে যেতে যেতে হঠাৎ মালতী দেবী একটা গাছের ঝোপে লুকিয়ে পড়লেন। পিছনে ফিরে বৌদিকে দেখতে না পেয়ে শ্যামল তখন বৌদি বৌদি, ব'লে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

'টু' ব'লে মালতী দেবী ছোট মেয়ের মত হাসতে হাসতে আর একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন। শ্যামল এদিকে যায় ত তিনি অন্যদিকে যান। এইভাবে ছুটোছুটি করতে করতে মালতী দেবীর কপালে ঘাম দেখা দিল।

তিনি হাসতে হাসতে ঘাটের চাতালে একটা বকুল গাছের তলায় বসে পড়লেন। তারপর ছেলেমানুষের মত মুখে হাত দিয়ে বললেন, ঠাকুরপো, এখন ভাই 'আব্বা'।

শ্যামলের সঙ্গে কৃষ্ণনারায়ণ বাবুর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। তার মায়ের সঙ্গে বাল্যকালে জমিদার-গিন্নী সই পাতিয়েছিলেন। সেই সূত্রে শ্যামল কৃষ্ণনারায়ণ বাবুকে দাদা বলে, আর তিনিও তাকে ছোট ভায়ের মত দেখেন। কোন ক্রিয়া-কর্ম্মেই তিনি তাকে বাদ দেন না। বাড়ীর সর্ব্বত্র তার অবাধ গতি।

শ্যামল বৌদিকে বহুবার বহুরূপে দেখেছে কিন্তু বৌদির এ মূর্ত্তি দেখে সে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেল। এমন প্রাণোচ্ছল রূপ সে আর কখনো দেখেনি। তাই তাড়াতাড়ি একরাশ ফুল এনে বৌদির

পায়ের উপর ঢেলে দিতে দিতে সে বললে, বৌদি তোমাকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

সত্যি! ব'লে এমন ভাবে মালতী দেবী তার দিকে চাইলেন যে শ্যামল আর তাঁর চোখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিতে পারলে না। চেয়ে চেয়ে তার যেন চোখ আর ভরে না!

মৃদু কণ্ঠে সে তখন বললে, বৌদি তুমি যদি গান গাইতে জানতে তাহলে কি সুন্দর হ'তো!

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মালতী দেবী বললেন, তাহ'লে তোমার খুব ভাল লাগত না? কিন্তু আমি গান জানিনা এ কথা তোমায় কে বললে ঠাকুরপো?

ব্যস্ত হ'য়ে সে বললে, কৈ কোনদিন ত তোমার মুখে শুনিনি! তাহ'লে তুমি গানো জানো?

—আচ্ছা আজ তোমার সে সাধমেটাবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে একথা আর কাউকে কোন দিন বলবে না!

তাড়াতাড়ি শ্যামল বললে, তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, কাউকে বলবোনা বৌদি!

মালতী দেবী তখন গাইলেন—

'অঙ্গনে আওয়ব যব রসিয়া
পালটী চলব হম্ ঈষৎ হাসিয়া'

তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন অমৃত ঝরতে লাগল।

বিস্ময়বিমূঢ়ের মত নিষ্পলকনেত্রে মালতী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে শ্যামল ভাবতে লাগল সত্যিই কি এই গান তিনি তাকে শোনাচ্ছেন, না মানব লোকের উর্দ্ধে কোন দেবতা আছেন যাঁর চরণে তিনি

নিঃশেষে তাঁর অন্তরের সমস্ত আনন্দ উজাড় ক'রে ঢেলে দিচ্ছেন। সে বুঝতে পারেনা। তার মাথা কেমন ঘুলিয়ে যায়।

গান থামতেই তাঁর একটা হাত ধরে শ্যামল আবেগ-থরথর কণ্ঠে বললে, বৌদি তুমি মানবী নও—স্বর্গের অপ্সরী!

তার চেয়েও বেশী! হাসিতে খুসিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে মালতীদেবী বললেন।

—তার মানে?

—তার মানে, শুধু গান শুনেই যদি তুমি আমায় অপ্সরী বলো ত নাচ দেখলে নিশ্চয়ই আরো কিছু বলবে।

নাচ! বিস্মিত হ য়ে শ্যামল বললে, তুমি নাচতেও জানো বৌদি?

আজ আমি সব পারি ঠাকুরপো এই দেখ। বলে মালতী দেবী নাচতে শুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ করে গান ধরলেন—

"আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আর
সঙ্গীতে বিরাজে"

শ্যামল তরুণ যুবক। এই নৃত্যময়ী অপরূপ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে হঠাৎ তার বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে সে মালতী দেবীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ তাঁর খোঁপায় গুঁজে দিতে গেল।

হঠাৎ তাঁর নাচ গান থেমে গেল। মুখের হাসি যেন নিমেষে কোথায় মিলাল। চকিতে তার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মালতী

দেবী বললেন, ঠাকুরপো শিগ্‌গির চলে যাও এখান থেকে, লক্ষ্মী মণিটী আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

শ্যামল সঙ্কুচিতকণ্ঠে বললে, আমি না থাকলে তোমার ভয় করবে না?

না। বরং ঠিক তার বিপরীত হবে। তুমি না থাকলে ভয়টাও আমার আর থাকবে না।

এই কথা শুনে অপরাধীর মত লজ্জিত হ'য়ে ঘাড় হেঁট করে শ্যামল সেখান থেকে প্রস্থান করলে।

তাকে চলে যেতে দেখে তখন মালতী দেবী একবার যেন পিছন থেকে তাকে ডাকলেন।

কিন্তু শ্যামল হয়ত সে ডাক শুনতে পেলে না সে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

গল্প এইখানে শেষ হলো।

আমি ধীরে ধীরে খাতাখানি মুড়ে অরুণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। অরুণ তখনো চাঁদের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে বসেছিল। আমি কোন কথা না বলে খাতাখানি তার সামনে ধরলুম। অরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেটা হাতে করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং আমার পিছনে পিছনে নৌকা থেকে নেমে এলো।

তারপর ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আমরা ধর্ম্মশালার পথ ধরলুম। দু'জনের মুখেই কোন কথা ছিল না। চুপচাপ চলছিলুম।

কিছুদূর গিয়ে প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে অরুণ। মৃদুকণ্ঠে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল দাদা?

আমি বললুম, অরুণ, তুমি যা লিখেছ সব কি সত্যি?

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে বললে, যদি বলি হ্যাঁ!

আমি বললুম, তাহ'লে কেমন হয়েছে আমি তা বলতে পারবো না।

সে বললে, কেন ?

আমি বললুম, রমণী আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়—তারা কি এবং কি চায় আমি আজও বুঝতে. পারলুম না। যত দেখছি তাদের তত আমার বিস্ময় বাড়ছে! তাই যা জানি না তার সম্বন্ধে মতামত দিতে যাওয়াকে আমি ধৃষ্টতা মনে করি।

অরুণ আর কোন কথা আমায় জিজ্ঞেস করলে না। একেবারে ধর্ম্মশালায় গিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লো। মনে হ'লো যেন সে কোন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

আমিও চুপচাপ নিজের বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত চোখে ঘুম এল না। কেবল সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আমার মনে হতে লাগল, স্ত্রীলোক কি চায়! কি তাদের জগতে কাম্য!

পরদিন সকালে উঠে আমি বিছানা-পত্তর বাঁধছি এমন সময় অরুণ এসে বললে, দাদা, আর একটা দিন থেকে যান না!

বোধহয় আরো কিছু তার বলবার ছিল।

বললুম, পরের চাকরী করি ভাই, আজ আমার যেতেই হবে এখান থেকে। তবু একদিন এখানে দেরী হ'য়ে গেল।

অরুণ বললে, আবার কবে দেখা হবে দাদা ?

আমি বললুম, যেমন করে এখন হয়েছে ঠিক তেমনি করেই আবার হবে!

অরুণ তখন বললে, চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি! এই বলে সে আমার সঙ্গে ষ্টেশনে এলো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাশীর কাজ শেষ হতেই আমার ওপর দার্জ্জিলিঙে যাবার হুকুম হ'লো।

দার্জ্জিলিঙে গেলুম। কিন্তু সেখানে কাজের সুবিধে হ'লো না। অথচ কোম্পানীর বিশ্বাস সেখানে কাজ ভাল হবেই। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কোম্পানী নাকি হাজার হাজার টাকার ওষুধ সেখানে বেচে বড়লোক হ'য়ে গেছে। তাই ফিরে আসবার কিছুদিন পরে কোম্পানী আবার আমায় সেইখানেই পাঠালে। এইভাবে দুবছরে আমায় সেখানে আটবার যেতে হয়েছিল।

দার্জ্জিলিঙকে আমার মনে হতো ভূস্বর্গ বলে। পৃথিবী থেকে বহু উর্দ্ধে মেঘলোকে সে এক অদ্ভুত রাজত্ব! যেন স্বপ্নের দেশ! শহরের কোলাহল নেই, কোন আবর্জ্জনা মলিনতা নেই! শুধু ফুল, শুধু রঙ, শুধু মেঘ ও কুয়াশা, বৃষ্টি ও আলোয় মেশান এক নতুন জগত। তার আদি নেই, অন্ত নেই। সে চির সুন্দর! সে চির নূতন!

একটী হোটেল ছিল সেখানে আমাদের বাঁধা। আমি এবং আমার মত আরো কতকগুলি লোক ফি বছরে সেখানে গিয়ে উঠি। আমাদের এই ক'টী লোকের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। সারা বছর কেউ কারো খোঁজ রাখি না অথচ সেখানে গেলেই যেন একান্ত আপনার হয়ে উঠি। দুবছর ধ'রে এইরকম চলে আসছিল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রা—খেয়ে, ঘুমিয়ে, আরামে দিন কেটে যায়। হুড়োহুড়ি নেই, দৌড়োদৌড়ি নেই, নতুন জায়গা

দেখবার জন্য কোন ব্যাকুলতা নেই—উপভোগের অলসতায় শিথিল ও মন্থর দিনগুলি!

শেষবারে একটা ঘটনা ঘটেছিল তার কথাই বলছি।

একদিন বেলা পর্য্যন্ত তাসখেলা চলছে, বোধকরি বারোটা বেজে গেছে তখন। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় ওপরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

ম্যানেজারবাবুকে জিগ্যেস করলুম, ব্যাপার কি?

তিনি আমাদের কাছে বসেই তাস খেলছিলেন। বললেন, আর কি, কুলির সঙ্গে পয়সা নিয়ে খেচাখেচি চলেছে। এই 'মেলে' একজন নতুন বোর্ডার এলেন কিনা 'স্পেশাল ক্লাশে।'

স্পেশাল ক্লাশ শুনে আমরা সবাই যেন একটু সচকিত হ'য়ে উঠলুম। আমাদের চেয়ে কতখানি ধনী এবং কতবেশী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তা জানবার জন্য সবার মনে নেহাতই একটা অহেতুক কৌতূহল দেখা দিল।

আমি বললুম, কি রকম বড়লোক বাবা, কুলির সামান্য পয়সা নিয়ে মারামারি করে!

আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, আরে মশাই গরীবের পয়সা মেরেই ত লোকে বড় হয়—এই জন্যেই ত আমাদের কিছু হ'লো না।

তারপর ম্যানেজারকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, দেখবেন দাদা শেষকালে আসল মেরে না সরে পড়ে—গোড়াতেই যা নমুনা ছেড়েছে।

এমন সময় একটী কুলী রমণী এসে ঢুকলো আমাদের ঘরে। পাহাড়ী মেয়ে, গাল দুটো আপেলের মত লাল, চোখ ছোট ছোট, নাকটা চ্যাপটা কিন্তু ওদেশের সাধারণ মেয়ের মত বেঁটে ও মোটা নয়। অপেক্ষাকৃত ঢ্যাঙ্গা এবং একহারা চেহারা—বন্য ও রুক্ষ চোখের চাহনি, সর্ব্বাঙ্গে যেন

জঙ্গলের সজীবতা! মুখ দেখে বয়েস বোঝা শক্ত—যোলও হ'তে পারে, আবার চব্বিশ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

বেণী দুলিয়ে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সে ম্যানেজার-বাবুকে যা বললে তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, চার আনা করে কুলির রেট্‌ কিন্তু এই বাবুটী কিছুতেই দু'আনার বেশী দিতে চাইছেন না—তার ওপর আবার কটু ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন। তাই সে ম্যানেজার বাবুকে ডাকতে এসেছে একটা মীমাংসা ক'রে দেবার জন্য।

এরকম মীমাংসা যে প্রায়ই ম্যানেজারবাবুকে করতে হয় একথা আমরা সবাই জানতুম। তাই নতুন অতিথিটিকে দেখবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু মজা উপভোগ করবার জন্যও বটে তাঁর পিছু পিছু আমরা ওপরে গেলুম।

ম্যানেজারবাবুকে দেখে ছ'ফুট লম্বা ও অতি বলিষ্ঠ একটি যুবক, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং বললে, দেখুন ত মশায় দু'আনা পয়সা দিয়েছি ব'লে শালী এখানে ফেলে দিয়ে চলে গেল। বললে, চার আনার এক পয়সা কম নেবে না। আর আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি ওর চেয়ে এক আধলা বেশী দেবো না।

ম্যানেজারবাবু বললেন, কিন্তু ওরা ত চার আনা করেই পেয়ে থাকে—ওই ওদের রেট।

বলেন কি মশায়, এযে ডাকাতি! এই বলে যুবকটি একবার আমাদের সকলের মুখের দিকে চাইলে। তারপর ঈষৎ অনুযোগের সুরে আবার বললে, এসব আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। এইখান থেকে এইটুকু পথ বোধহয় তিনমিনিটেরও বেশী হবে না—চার আনা রেট? জানেন কলকাতায় এটুকুর জন্যে আমরা দু'পয়সা দিয়ে থাকি?

ম্যানেজারবাবু বললেন, কিন্তু এটা ত কলকাতা নয়—তা ছাড়া—

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে থেকে একজন খপ ক'রে বলে উঠলেন, তাছাড়া—আপনি একেবারে বাছাই-করা মেয়েটাকে নিয়েছেন কিনা! এই বলে তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই এমন হো হো করে হেসে উঠলেন যে আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ না দিয়ে পারলুম না।

কিন্তু সেই যুবকটি এই হাসিতে যোগ দিলে না। শুধু গম্ভীরভাবে বল্‌লে, এর চেয়ে বেশী দিতে আপনারা আমায় অনুরোধ করবেন না।

ম্যানেজারবাবু একটু উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, এর জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবার আমাদের কি দায় পড়েছে? যা খুসী আপনি করুন! তবে এরা লোক ভাল নয়, সেই জন্যেই আমার আসা। মনে করবেন না যে এর মধ্যে হোটেলের কোন কমিশন বন্দোবস্ত আছে।

এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং আমরাও সকলে যে যার ঘরে চলে গেলুম।

আমার ঘর ছিল ওপরে তাই আমি আর নীচে গেলুম না। কিন্তু ঘরের মধ্যে গিয়ে শুনতে পেলুম যুবকটি নিজে নিজে বলছে, ভাল লোক নয়, ওঃ—আমিও সিমলে কাঁসারীপাড়ার ছেলে—ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করবে আমার কাছ্ থেকে?

মেয়েটী তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাই দুআনিটী কুড়িয়ে নিয়ে তার হাতে দিয়ে যুবকটী বললে, রূপের জন্যে পয়সা দেবার ছেলে আমি নই—তার জন্যে এখানে আরো অনেক বাবু আছেন তাদের কাছে যাও। তবে যা পরিশ্রম করেছ তার চেয়েও বেশী দিয়েছি, শুধু অবলা, স্ত্রীজাতি বলে—পুরুষ হলে দু'পয়সার বেশী কমল চৌধুরী কিছুতেই দিত না—যাও ভাগো হিঁয়াসে।

মেয়েটী তার গায়ের ওপর পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে নীচে নেমে গেল।

আমার মনে বড় ভয় হলো। কি জানি, শুনেছি পাহাড়ীরা ভয়ানক হিংস্র, যদি ভদ্রলোকের কোন অনিষ্ট করে!

আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হ'লো, বহুদিন পরে এই রকম একজন বাঙ্গালী যুবকের সাহস দেখে। তখন মনে হলো ঠিকই করেছে।

কিছুক্ষণ পরে আরো পাঁচ-ছ'টি পাহাড়ী পুরুষ ও রমণীকে নিয়ে সেই কুলিমেয়েটী আবার তার ঘরের সামনে এসে হাজির হ'লো।

যুবকটী ঘরের মধ্যে থেকে চীৎকার করে উঠলো যাও উল্লুক, শুয়ারকো বাচ্ছা, আবি নিকালো হিঁয়াসে—দুআনা সে এক কৌড়ী যাস্তি নেহি দেগা—ভাগো আবি, নেহি ত—এই বলে একটা চাবুক হাতে করে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।

আমি ভীরু, দুর্ব্বল এবং অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকদের মতই কাপুরুষ। তাই এখনি চোখের সামনে কি একটা কাণ্ড ঘটবে মনে ক'রে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম। কি জানি আমায় আবার না এর লোক মনে করে!

যাই হোক যুবকটীর ভীষণ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দেখে কিনা জানি না তারা তখন সেই দুআনিটা কুড়িয়ে নিয়ে কোন কথা না বলে শুড় শুড় করে চলে গেল।

বিকেলবেলা আবার পাশা খেলতে খেলতে আমরা আমাদের নতুন অতিথি কমল চৌধুরীর ভবিষ্যত যে খুব খারাপ সে বিষয়ে আলোচনা করছিলুম। এমন সময় একটি বাঙ্গালীর ছেলে এসে বললে, স্যার

চাকরীর চেষ্টায় এসেছিলুম, চাকরী ত মেলেইনি উল্টে চারদিন খাওয়া হয়নি এবং দেশে ফিরে যাবার গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত নেই, যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনারা কিছু কিছু সাহায্য করেন ত আমার বিশেষ উপকার হয়।

আমরা তখন মজা দেখবার জন্য তাকে কমল বাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিলুম।

সাহেবের বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে মুখে পাইপ ধরিয়ে, হাতে একটা ছড়ি নিয়ে তখন তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন।

ছেলেটী এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে তাঁর কাছে হাত পাতলে এবং একে একে তার দারিদ্র্যের কারণ বিবৃত করতে লাগল।

কমলবাবু একটা ধমক দিয়ে বললেন, চুপ, আমি বেশী কথা শুনতে চাই না—তুমি কি বাঙ্গালী?

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে তিনি শুধু একখানা পাঁচটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কারো দিকে দৃক্‌পাত না করে একেবারে রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন।

আমরা তাই দেখে শুধু কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইলুম। তারপর নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আবার খেলায় মনোযোগ দিলুম।

তারপর খেলতে খেলতে কত জুয়াচোর যে সাহেবী পোষাক পরে কলকাতার পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, আর কিভাবে লোক ঠকায়, সেই সম্বন্ধে জানা, অজানা, লোকমুখে শোনা গল্প যিনি যতটুকু জানতেন দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগলেন।

আমি মুখে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেও কমলবাবুর

সম্বন্ধে কি জানি কেন সে রকম কোন ধারণা মনে পোষণ করতে পারলুম না।

এইসব গল্প শুনে ম্যানেজারবাবুর মনে এমন ভয় ধরে গেল যে তিনি সেইদিনই রাত্রে একটা বিল করে সাতদিনের টাকা আগাম চেয়ে বসলেন তাঁর কাছে।

ভয় নেই, পালাবো না—এই বলে কমলবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। প্রাণময়, বলিষ্ঠ হাসি। তারপর একটা একশো টাকার নোট পকেট থেকে বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, বাকী পঁয়তাল্লিশ টাকা এখুনি দিয়ে যাবেন, আমার কাছে চেঞ্জ নেই।

নোটটা হাতে নিয়ে ম্যানেজারবাবুকে কয়েক মুহূর্ত্ত নাড়াচাড়া করতে দেখে কমলবাবু বললেন, এখন যদি চেঞ্জ না থাকে ত নোটটা আপনার কাছেই রেখে দিন, কাল সকালে যখন হয় দেবেন।

ম্যানেজারবাবু ভাল করে কথার উত্তর দিতে না পেরে শুধু বললেন, যে আজ্ঞে।

নীচে নেমে আসতেই আমার বন্ধুরা তাঁকে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, কি হ'লো, দিলে টাকা?

ম্যানেজারবাবু একজনের হাতে নোটটা দিয়ে বললেন, দেখুন ত ঠিক আছে কিনা এটা!

আর একজন ফস্ করে বলে উঠলেন, আজকাল আবার যে রকম জাল নোটের আমদানী হয়েছে। এই আজকের কাগজে ছিল একটা খবর, দেখেননি?

তাই নাকি? বলে ম্যানেজারবাবু নোটখানাকে নিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে কমলবাবু প্রবেশ করলেন মস্তবড় একটা আপেল ছোট ছেলের মত কামড়াতে কামড়াতে।

তারপর আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে আপেল দিতে দিতে বললেন, কিছু মনে করবেন না—we are all friends। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। এই বলে হো হো ক'রে নিজেই হেসে উঠলেন।

আমি ও ম্যানেজারবাবু দু'জনেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলুম। অন্য সকলে কিন্তু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কমলবাবু কিছু বুঝতে না পেরে,একবার তাঁদের মুখের দিকে ও একবার আমাদের মুখের দিকে চেয়ে নাটকীয়ভাবে নমস্কার করে বললেন, আচ্ছা আজ তাহলে চলি—অসময় আপনাদের রসভঙ্গ করলুম—কাল অন্য সময় এসে আবার আলাপ করা যাবে!

কমলবাবু চলে যাবার পর আমার বন্ধুরা বললেন, ওঃ খুব বড়লোকী চালটা মেরে গেল আমাদের কাছে। আমরা যেন জীবনে আপেল কখনো চোখে দেখিনি, তাই উনি আমাদের দয়া করে খেতে দিয়ে গেলেন। ব্যাটার দম্ভ দেখলেন!

এই বলে তাঁরা যে আপেলগুলো হাত পেতে নিয়েছিলেন সেইগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জান্‌লা দিয়ে।

আমি আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেলুম।

পরদিন সকালে আমরা ড্রয়িং রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় কমলবাবু হ্যাট-কোট পরে সেখানে এসে ঢুকলেন।

তারপর বোধহয় কথোপকথনের ছলেই প্রথমে কথা পাড়লেন, কালকের আপেলগুলো কেমন খেলেন? বাস্তবিক কি বড় ফল—আর কি সরস!

কলকাতায় হাজার বেশী দাম দিলেও এরকম জিনিষ পাওয়া যায় না—কি বলুন? Wonderful apples!

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একজন তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, কি রকম খেলেন মানে? আমরা কি বাপের জন্মে কখনো আপেল খাইনি যে ওকথা জিগ্যেস করছেন? লজ্জা করলো না ওকথা মুখে আনতে? ওই দেখুন পড়ে আছে আপনার আপেল। এই বলে আঙ্গুল দিয়ে তিনি নীচের নর্দ্দমাটা তাঁকে দেখালেন।

কমল বাবু আর কাউকে কোন কথা না বলে' নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিন থেকে তিনি আর কারুর সঙ্গে আলাপ করতেন না—আমাদের সকলকে এড়িয়ে চলতেন।

আমাকেও তিনি দলের একজন মনে ক'রে উপেক্ষা করতেন। আমিও কোনদিন তাঁর সে-ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করবার চেষ্টা করিনি।

একই দেওয়ালের দু'পাশে আমরা বাস করতুম দু'জন, একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত। তবে কেন জানি না, আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমি একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করতুম তাঁর প্রতি। এমন অদ্ভুত যুবক—এমন প্রাণচঞ্চল যৌবনের সজীব প্রতিমূর্ত্তি আমি আর কখনো দেখিনি!

রবিবার দার্জ্জিলিঙে হাট বসে। বাজারে ঢুকে আমি এটা ওটা নানারকম জিনিষ দর করে বেড়াচ্ছিলুম।

এমন সময় হঠাৎ কমল বাবুর গলা পেয়ে চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখি, সেদিনের সেই কুলী রমণীটির সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধিয়েছেন। সর্ব্বনাশ! এইবার বোধহয় একা পেয়ে

পাহাড়ীরা সেদিনের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে, এই মনে ক'রে আমি ছুটে সেখানে গেলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য! গিয়ে দেখি দু'টী আনারস হাতে ক'রে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং উত্তেজিতকণ্ঠে বলছেন, সবাই দিচ্ছে দু'আনা, দশ পয়সা জোড়া আর তুই চাস্ ছ'আনা—জোচ্চুরী পেয়েছিস্?

তাঁর হাত থেকে আনারস দু'টো কেড়ে নিয়ে সেই কুলি মেয়েটি বললে, আমার খুসী! বাজারে যেখানে সস্তা দিচ্ছে সেখান থেকে নাওগে যাও—আমি ত তোমায় সাধাসাধি করছি না নেবার জন্যে। আমার জিনিষ আমি ছ'আনার আধ আধ্‌লা কমে তোমায় বেচবো না।

এই বলে' দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে, ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে কমল বাবুর মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। উদ্যতফণা ভুজঙ্গিনীর সঙ্গে যেন মুহূর্ত্তে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল!

কমল বাবু আর কোন কথা না বলে ছ'আনা পয়সা তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আনারস দু'টো নিয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি তাঁর দিকে চেয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল—গর্ব্বের হাসি।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম! সেই মেয়েটিই কিছুক্ষণ আগে আমার কাছ থেকে তিন আনা চেয়েছিল সেই ফল দু'টীর জন্য।

এর কিছুদিন পরে একদিন ঘুম থেকে যে রাস্তাটা বরাবর জলাপাহাড় হয়ে দার্জ্জিলিঙের দিকে নেমে এসেছে সেইটে দিয়ে একাকী ফিরছিলুম। সন্ধ্যা তখন হয়নি অথচ দূরে ধূসরতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত সবে দেখা দিয়েছে। এমন সময় অতি নির্জ্জন একস্থানে দেখি কতকগুলি পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কমল বাবুকে দেখে আমি একটু আশ্চর্য্য হলুম! আমি

গিয়েছিলুম কোম্পানীর কাজে। কিন্তু ঘুম থেকে তখন ফেরবার কোন গাড়ী ছিল না বলে ওই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলুম, তাই ব্যাপার কি জানবার জন্য যেমন উঁকি মেরেছি, দেখি সেই অদ্ভুত কুলী-রমণীটি নাচ্ছে। তার দেহের অধিকাংশ স্থান অনাবৃত এবং নৃত্যভঙ্গী উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল—কালবৈশাখীর পদ্মার মত চিত্তবিভ্রমকারী! নৃত্যের তালে তালে ডুগ্ডুগি বাজ্ছে আর কয়েকটি নারী তার সঙ্গে গান গাইছে। পাহাড়ী পুরুষরা তার সেই দেহ-সুষমা যেন ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি দিয়ে শুষে নিচ্ছে। কারো কোন হুঁস নেই।

নাচ চলেছে।

এক একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা মুখে একটা বিশ্রী শব্দ ক'রে উঠছে; আর কেউ একটা সিগ্রেট, কেউ একখিলি পান, কেউ বা একটা রঙ্গীন পুঁতির মালা তার পায়ের তলায় ফেলে দিচ্ছে! নাচতে নাচতে সে তাদের অভিবাদন ক'রে সেটা হাতে করে তুলে নিচ্ছে।

কমল বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চট করে একটা আনি বার ক'রে তার পায়ের তলায় ফেলে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন তার নৃত্যের তাল কেটে গেল। চকিতে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে আনিটা কুড়িয়ে নিলে, তারপর ছুঁড়ে সেটা ফেলে দিলে জঙ্গলের মধ্যে।

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো কমল বাবুর মুখের দিকে চেয়ে। অপমানে তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত সিংহের মত লাফ দিয়ে তিনি একেবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন্ এবং জিগ্যেস্ করলেন, কেন আমার পয়সা ফেলে দিলে?

পাহাড়ী মেয়েটী তাঁর মুখের ওপর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, আমার এই নাচের কি মূল্য চার পয়সা ?

কমলবাবু বললেন, কিন্তু একটা পান কিংবা একটা সিগ্রেটের চেয়ে ত অনেক বেশী ?

মুখে একটা কুৎসিত আওয়াজ ক'রে মেয়েটী বললে, ওরা আমার ইয়ার—ওদের সামান্য দান আমার কাছে অমূল্য। এই বলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে যেলোকটা ডুগডুগি বাজাচ্ছিল তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে সে আবার নাচতে স্থরু করলে।

কমলবাবু তখন এতগুলো লোকের সাম্‌নে অপমানিত হওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য কি না জানি না, একটা টাকা বার করে তার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে রাগে ও অপমানে ফুলতে ফুলতে বাসায় ফিরে গেলেন।

মেয়েটি আর একবার তাঁর দিকে চেয়ে মুচ কি হাসল।

মেয়েটি কেমন কৌশলে সেই প্রথম দিনের অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাসার পথ ধরলুম। কমলবাবু আমায় দেখতে পাননি।

এইভাবে আমার সেখানকার একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে যেন একটা নাটকের অভিনয় শুরু হ'লো। কমলবাবু নায়ক, আর সেই কুলি রমণীটি নায়িকা। এবং একদিন এর পঞ্চমাঙ্ক শেষ হ'য়ে কেমন করে যবনিকা পড়লো এইবার সেই কথা বলবো।

হোটেলের অপর লোকদের অর্থাৎ আমার বন্ধুবান্ধবদের আর তাঁর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না। এবং আমিও কিছু তাদের কাছে বলতুম না।

কিন্তু বলা বাহুল্য ম্যানেজারবাবু তাঁর প্রতি খুব খুসীই ছিলেন। কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্যের চেয়েও বেশী কিছু পেতেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন আমি 'ম্যালে' বেড়াচ্ছি এমন সময় দেখি কমলবাবু একটা ঘোড়ার দর করছেন একটী সহিসের সঙ্গে। সহিস বলছে এক টাকা ঘণ্টা, তিনি বলছেন বারো আনা।

ইত্যবসরে মুখে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই কুলি রমণীটি সেখানে এসে হাজির হ'লো। এবং তার সেই অর্দ্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা সহিসের হাতে গুঁজে দিয়ে ঘোড়ার লাগামটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলে। তারপর কমলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিলে। তাঁকে অপমান করাতেই যেন তার আনন্দ!

কমলবাবু তখন রাগে ফুলতে ফুলতে সহিসটাকে বললেন, তুমি দেড়টাকা, দু'টাকা, যা চাও তাই দেবো শুধু ওই ঘোড়াটাকে আমায় এনে দাও।

সহিস হেসে বললে, পাঁচ টাকা দিলেও আর আমি ও ঘোড়া দিতে পারবো না।

তখন আর একটা ঘোড়া নিয়ে কমলবাবু তার পিছনে পিছনে তীরবেগে ছুটলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলের সামনে একটা রিক্সা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। দেখি কমলবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে এসে সেই পাহাড়ী মেয়েটি বিছানায় শুইয়ে দিলে। তাঁর হাতে, পায়ে, মাথায়, বহু জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে বললুম, ব্যাপার কি দাদা, ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন বুঝি ?

তিনি বললেন, আমি পড়িনি তা বলে, ঘোড়াটাই পড়ে গেছে।

আমি বললুম, পাহাড়ীদের সঙ্গে কি বাঙ্গালীরা পাল্লা দিতে পারে ? তা মেয়েই হোক্ আর পুরুষই হোক্। ওদের এক একটা মেয়ের ধাক্কা আমাদের চারটে পুরুষ সামলাতে পারে না।

কমলবাবু সদম্ভে উত্তর দিলেন, জিগ্যেস করুন এই মেয়েটাকে, একজন বাঙ্গালীর ছেলে তার ঘোড়াকে রেসে মেরে দিয়েছিল কিনা— কিন্তু ঘোড়াটার পা মচ কে গেল সে কি আমার দোষ ?

না, না আপনার কোন দোষ নেই—আপনারই জিৎ। এখন তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন ত ? তাহ'লে অনেকটা সুস্থ বোধ করবেন।

ম্যানেজার বাবু ততক্ষণে ছুটোছুটি ক'রে চা, গরম দুধ, লুচি এনে কমল বাবুকে খেতে দিয়েছিলেন।

কমল বাবু খেতে খেতে বললেন, ম্যানেজার বাবু আমাকে আলাদা একটা লোক ঠিক ক'রে দিতে হবে—ডাক্তার বাবু বলে দিয়েছেন অন্ততঃ আট ন'বার ক'রে দিনে সেঁক দিতে হবে।

আচ্ছা এখুনি লোক দেখ্ছি, বলে ম্যানেজারবাবু তৎক্ষণাৎ লোকের সন্ধানে চলে গেলেন।

মেয়েটি তখন বিছানা, লেপ, তোষক পরিষ্কার করে, কমলবাবুকে ফরসা কাপড় চোপড় পরিয়ে, তাঁর জুতোটা সাফ করতে লেগে গেছে।

কমলবাবু মেয়েটীকে বললেন, আরে তুমি কেন ওসব করছো, আমার লোক এখুনি আস্ছে।

মেয়েটী বললে, না লোক আর আনতে হবে না—আমি এ কাজগুলো সব করে দেব। বরং যে টাকাটা তাকে দিতে সেইটে আমায় দিয়ো—আমি গরীব মানুষ, আমার তাতে উপকার হবে।

কমলবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, পয়সার জন্যে সব করতে পারে এরা, কি বলুন মিঃ ঘোষ?

আমি বললুম, একেবারে ছিনেজোঁক—একবার পয়সার স্বাদ পেয়েছে কি আর রক্ষে নেই।

যাই হোক, সেই মেয়েটিকেই শেষ পর্য্যন্ত রাখা হ'লো।

মেয়েটির একান্ত সেবায় পনেরো দিনের মধ্যে কমলবাবু বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। সে ট্রেণের সময়টা শুধু মোট বইত। আর বাকী সময়টা তাঁর সেবা করতো। অশিক্ষিত পাহাড়ী মেয়ে যে এমন সেবা করতে পারে তা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

এইভাবে আরো কয়েকদিন কেটে যাবার পর কমলবাবু বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

মালপত্তর বাঁধাবাঁধির ধুম পড়ে গেল।

আমিও কমলবাবুর সঙ্গে কলকাতায় ফিরবো বলে স্থির করলুম।

তিনি মেয়েটিকে বললেন ষ্টেশন থেকে কুলি ডেকে আনতে।

সে বললে, কেন আমিই সব নিয়ে যাবো—বা রে, এ পয়সাটা কেন আমি ছাড়বো?

মেয়েটীর পয়সার কামড় খুব বেশী ব'লে আমি চুপি চুপি হোটেলের চাকরকে দিয়ে আমার মালপত্তরগুলো ষ্টেসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

যথাসময়ে কমলবাবুর মালপত্তরগুলি নিয়ে সেই মেয়েটী ষ্টেশনে গেল। এবং গাড়ীর মধ্যে বিছানা পেতে তাঁকে শুইয়ে তাঁর জিনিষগুলি একটি

একটি ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে গেল। তখনো অবশ্য গাড়ী ছাড়বার দেরী ছিল।

আমি কমলবাবুর সামনের বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিয়েছিলুম। গাড়ী ছাড়বার আর দশ মিনিট দেরী আছে দেখে পানওলাকে ডেকে এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনলুম এবং কমলবাবুকে একটা দিয়ে নিজে একটা ধরালুম।

কমলবাবু সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে বললেন, সে শালী আবার গেল কোথায়, এখনো ত পয়সা নিতে এলোনা।

আমি বললুম, কিচ্ছু ভাবতে হবে না ঠিক সময়ে আসবে'খন—ততক্ষণে হয়ত আরো দু'একটা মোট সে 'কামিয়ে' নিচ্ছে।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আবার ঝগড়া করবার জন্যে খানিকটা সময় হাতে রাখতে হবে ত? দর কষাকষি ও করবেই।

এই বলে কমলবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন প্ল্যাটফর্ম্মে তাকে দেখা যায় কিনা। তারপর আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, প্ল্যাটফর্ম্মে ত দেখা গেল না—কোথায় হয়ত গাড়ীর মধ্যে পয়সা নিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। ওঃ! পয়সা রোজগার করতে জানে বটে এ জাত, কি বলুন?

আমি বললুম, কত নিলে এই ক'দিন কাজ করার দরুণ?

নিলে কি মশায়? দশটাকা দিতে গেলুম বললে এখন থাক একসঙ্গে একেবারে গাড়ীতে গিয়ে নেবো। শালীর নিশ্চয়ই আরো কিছু নেবার মতলব আছে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে!

আমি বললুম, খুব ধড়িবাজ মেয়ে! আপনার কাছ থেকে পয়সা শোষণ করবার জন্যে ব্যেটি যেন সর্ব্বদা হাঁ ক'রে থাকত।

কমলবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি দেখছি সেটাও লক্ষ্য করেছেন!

এমন সময় পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়লো।

কমলবাবু ব্যস্ত হ'য়ে আর একবার প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে বললেন, কি হবে মশায় যদি না আসে?

আমি বললুম, কিছু ভাববেন না, এখনো পাঁচ মিনিট সময় আছে। ওজাত পয়সা না নিয়ে ছাড়বে ভেবেছেন? এখান থেকে যদি শিলিগুড়ি যেতে হয় তাও যাবে, একটা পয়সা ওদের বুকের একফোঁটা রক্ত!

আমার কথা শুনে কমলবাবু যেন একটু আস্বস্ত হ'লেন। তারপর সিগ্রেটটা ভাল ক'রে টানতে টানতে বললেন, তাই নাকি? এ রকম করে এরা? বলে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

করে না? এই ত গেল বছর আমার সঙ্গে একজন লোক যাচ্ছিল, তাকে শিলিগুড়িতে গিয়ে ধরে টাকা আদায় করলে। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে আর ব্যেটি বুঝতে পারেনি কোন গাড়ীতে মাল তুলেছে—এদিকে লোকটাও দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ বসেছিল··

আমি এই পর্য্যন্ত বলেছি এমন সময় গাড়ী ছেড়ে দিল।

কমলবাবু তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন কিন্তু কোথাও সেই মেয়েটীকে দেখতে পেলেন না।

তখন আর একবার তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, মনে করুন, যদি সে না আসে তাহ'লে তাকে এই টাকাটা পাঠাবো কেমন করে? হোটেলের ম্যানেজারবাবুকে 'ম্যানিঅর্ডার' করলে তিনি কি তাকে দিতে পারবেন না?

আমি বললুম, তবেই চিনেছেন হোটেলের ম্যানেজারদের! এখানকার

কুলিদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। ··· ব্যস্ত হবেন না, 'ঘুম' ষ্টেশনে গেলেই হয়ত তাকে দেখতে পাবেন !

কমলবাবু মুখে বললেন, না ব্যস্ত আর কি। কিন্তু মনে মনে রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলেন।

গাড়ী দস্তুরমত বেগে চলতে লাগল ঘুরে ঘুরে। কমলবাবু একমনে সিগ্রেট খেতে লাগলেন। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো বাহিরের দিকে। আমি বললুম, দেখুন ত কমলবাবু ঐ না সেই মেয়েটী দাঁড়িয়ে আছে।

কৈ—কৈ—বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

মেয়েটী একটী উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে, গাড়ীর দিকে চেয়ে, যেন কাকে খুঁজছিল। কমলবাবুকে দেখতে পেয়েই সে বুক থেকে একটা রুমাল বার করে নাড়তে লাগল বিলাতি কায়দায়।

তিনি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোট বার ক'রে তাকে দেখালেন। সে হাত নেড়ে জানালে, চাই না। তার মুখে ম্লান একটু হাসি দেখা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

কমলবাবু যতদূর দেখা যায়, সেই মেয়েটীর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তারপর কি যে ভাবতে লাগলেন চুপ ক'রে, তা একমাত্র তিনিই জানেন ! আমার সঙ্গে সারাপথ আর একটীও কথা বললেন না। একটী ছোট্ট কামরায় শুধু আমরা দুজন যাত্রী। কিন্তু দুজনের মাঝে যেন দুস্তর সাগর—নীরব ও নিস্তব্ধ।

এঁকে বেঁকে দারুণ চীৎকার করতে করতে গাড়ী ছুটতে লাগল।

শুধু তার বিকট ধ্বনি এসে মধ্যে মধ্যে আমাদের সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দিয়ে যাচ্ছিল।

আমি শালটা মুড়ি দিয়ে অস্তে আস্তে শুয়ে পড়লুম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শেষবার দার্জ্জিলিঙ থেকে ফিরে আমি একেবারে সোজা দেশে চলে গেলুম। এক মাসের ছুটী আমি আগে থেকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করেছিলুম। আমার দু'বছর চাকরী জীবনের মধ্যে এই প্রথম ছুটী। এই প্রথম আমি বাড়ী এলুম। কিন্তু এবার দেখলুম আমার অদৃষ্টে অদ্ভুত আদর অভ্যর্থনা! বাড়ীতে ত বটেই এমন কি বাইরেও। সবাই যেন আমাকে নতুন মানুষ বলে নতুন চোখে দেখছে। দু বছর আগে যাকে সবাই মানুষ বলে গণ্য করতেও ঘৃণা বোধ করতো এখন দেখি তারাই আমাকে একেবারে দেবতার আসনে বসাচ্ছে। কেউ বললে, তুমি বাবা দেশের নাম রাখবে। কেউ বললে, এমন ছেলে আমাদের গাঁয়ে আর নেই। নিজের চেষ্টায় এত রোজকার কে করতে পারে? সাবাস ছেলে! বাড়ীতে খুড়ো-খুড়ীর নিত্য নতুন আদর-যত্নের অভিব্যক্তি দেখেও মনে মনে হাসলুম। হায়রে পয়সা!

তখন বাঙ্গালীর ঘরের বেকারদের কথা মনে পড়ে কষ্ট হ'লো! কিন্তু কি করবো, এর জন্যে কে দায়ী! যুবকরা না তাদের অভিভাবকরা—তাই ভাবতে লাগলুম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা চিন্তা ক'রে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এ সংসারে পয়সাই কি সব? মানুষের সঙ্গে মানুষের এই স্নেহভালবাসার সম্পর্ক সবই কি তবে অর্থহীন? পুরুষ কি শুধু একটা অর্থউপার্জ্জন করবার যন্ত্র, সংসারে কি তার এই একমাত্র পরিচয়? তাই এই আদর যত্নকে তোষামোদ মনে ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল।

জীবনে আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি এই জিনিষটাকে—এই লোক-দেখানো আত্মীয়তা, এই অন্তরহীন সম্পর্ক !

যাক্ এ নেহাতই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে সংসারে কারো কিছু এসে যায় না। আর আমিও যে নিয়মিত খুড়োকে টাকা পাঠিয়েছি সেও কোন প্রত্যাশায় নয়, নেহাতই কর্ত্তব্যবোধে। কাজেই সে সব কথা এখন থাক। আসল কথাটা বলি।

আমি এক মাস ছুটী নিয়ে দেশে এলুম বটে কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতে ভীষণ জ্বরে পড়লুম। তারপর সেই জ্বর ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে হতে একবারে টাইফয়েডে পরিণত হ'লো। তিনমাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার পর কোনরকমে প্রাণটা সে যাত্রায় বেঁচে গেল। আরো মাস-তিনেক লাগল সুস্থ হতে। তারপর আবার যখন চাকরীতে জয়েন করবার দরখাস্ত দিলুম, তখন কোম্পানী থেকে আমায় লিখে পাঠালে, ব্যবসার অবস্থা বড় খারাপ এখন আর তাদের লোক নেবার প্রয়োজন হবে না। ভবিষ্যতে দরকার হ'লে অনুগ্রহ ক'রে আমায় তারা জানাবে !

আমার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এই দুবছরে রোজগার ক'রে যে টাকাটা জমিয়েছিলুম চিকিৎসায় সব খরচ হয়ে গেছে। একেবারে নিঃস্ব আমি তখন। বাঙ্গালীর ছেলে যাদের জীবন শুধু নির্ভর করে চাকরীর ওপর—পরের অনুগ্রহের ওপর—তারা যদি হঠাৎ তা থেকে বঞ্চিত হয় তাহ'লে তাদের সমস্ত জগৎ নিমেষে অন্ধকার হয়ে যায়—কোথাও কোন আলো, কোন আনন্দ আর তার জন্য অবশিষ্ট থাকে না !

আবার আমার বেকার জীবন শুরু হ'লো। শুধু ঘরে বসে দরখাস্ত লিখি আর তার উত্তরের আশায় পথ চেয়ে থাকি। এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল কিন্তু আর একটাও চাকরী যোগাড় করতে পারলুম না। ঘরে

বসে বসে বিরক্ত লাগে অথচ বাইরে বেরুবার পয়সাও নেই। কি করি ভেবে কোন উপায় ঠিক করতে পারিনা।

বাহির যেন আমায় ডাকে! যে সব দেশে ঘুরেছি তারা চুপি চুপি আমায় এসে বলে ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে আয়! সেই নদী পর্ব্বত, সেই প্রান্তর উপবন, সেই সব যেন একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তিবলে আমায় অহরহ টানতে থাকে। নাড়ীতে নাড়ীতে আমি তার আকর্ষণ অনুভব করি।

আমি বেশী দূর যাইনি। বাংলা ও বিহার বারবার ঘুরেছি শুধু একবার মাত্র কাশীতে গিয়েছিলুম। তবে আশা ছিল একদিন সমস্ত ভারতবর্ষকে দুচোখ ভরে দেখবো তাই যে অদৃষ্ট আমার এই সকল আশা ব্যর্থ ক'রে দিলে তাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিতে লাগলুম।

যে একবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে সে-ই জানে কি সে টান! কি সে যন্ত্রণা! অন্য লোককে তা বোঝাতে পারতুম না! আর বোধহয় একথা কেউ বুঝতে পারেও না।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। আমার এক বন্ধু এসে বললে—বৃন্দাবনে যাবি? আমার মা যাচ্ছেন সেখানে চেঞ্জে—দু মাস কিন্তু থাকতে হবে। অবশ্য খরচ সবই মা দেবেন!

একে বৃন্দাবন, তায় দু'মাস থাকা, তার ওপর খরচা লাগবে না! লাফিয়ে উঠলুম।

যাবি মানে? নিশ্চয়ই যাবো।—বলে বন্ধুকে আলিঙ্গন করলুম।

বৃন্দাবন সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে একটা স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। কি জানি কেন, তার নাম শুনলেই সমস্ত অন্তর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠতো। মীরার ভজন কিংবা রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে ছবি ফুটে ওঠে—হৃদয়ের

মাঝে যে ইন্দ্রিয়াতীত রসলোকের আবির্ভাব হয়, তেমনি হ'তো ওই স্থানটির নাম শুনলেই !

তাই যেমন করে হোক্ একবার বৃন্দাবনে যাব—মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। পৃথিবীর আর কোন দেশ যদি দেখতে না পাই, আর কোথাও যদি কখন যাওয়া না হয়, তাতেও দুঃখ নেই !

গরীবের ছেলে পল্লীগ্রামে থাকি, একটা পয়সার যে কি মূল্য তা বেশ ভাল ক'রেই বুঝি। তাই বাংলা দেশ থেকে ন'শো মাইল দূরে কোন স্থানে যাওয়া তখন আমার পক্ষে কল্পনাতীত সৌভাগ্য বলে মনে হ'তো।

বৃন্দাবনের নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা তখন মনে পড়ল। সেই সন্ন্যাসিনীর কথা। সে কুলত্যাগিনী ও চরিত্রহীনা জেনেও হঠাৎ তাকে আবার দেখবার জন্যে মনটা যেন অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠলো। কেন জানিনা ! যাকে মনে মনে ঘৃণা করেছি আবর্জ্জনার মত, তার কথা মনে পড়ে কেন এমন হয় তা বোধহয় যিনি অন্তর্য্যামী সকলের দৃষ্টির অন্তরালে বসে এই সব অঘটন ঘটান, তিনিই বলতে পারেন।

যাক্—আবার যে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে পারবো এই চিন্তা করে সেদিন রাত্রে আর চোখে ঘুম এলো না।

পরদিনই রওনা হ'লুম বন্ধু ও তার মায়ের সঙ্গে। পুরাতন ও অভিজ্ঞ তীর্থযাত্রী তাঁরা—বহুবার বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন। নতুনের প্রতি মোহ এখন আর তাঁদের নেই ; তীর্থদর্শনে আনন্দের চেয়ে পুণ্যার্জ্জন স্পৃহাই বেশী। গাড়ীতে উঠে বিছানা পেতে তাঁরা শুয়ে পড়লেন। আমারও বিছানা হ'লো কিন্তু আমি ঘুমতে পারলুম না। বহুদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে আজ আবার নতুন ক'রে জীবন পেলুম বলে বোধ হচ্ছিল। তাই বিস্ময়, বিস্ফারিত নেত্রে কাঁচের জানলার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে

রইলুম। উন্মত্তবেগে ট্রেণ ছুটতে লাগল। এতদিন যেসব বহু দূর দেশের কথা শুধু গল্প শুনেছি, যে সব নাম মানচিত্রে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি, আজ সেই সব স্থান প্রত্যক্ষ করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে যেন সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

দেশের পর দেশ ছেড়ে ট্রেণ চলেছে! সঙ্গে সঙ্গে মাটির চেহারা বদ্‌লাচ্ছে, মানুষের বেশভূষা বদ্‌লাচ্ছে, তাদের ভাষা আচার-ব্যবহার ভাবভঙ্গী, সমস্ত বদলে যাচ্ছে। আনন্দে বিস্ময়ে আমি হতবাক হ'য়ে গেলুম, চোখে ঘুম এলো না। রাত্রি কেটে গিয়ে প্রভাত হ'লো—প্রভাত কেটে গিয়ে মধ্যাহ্ন এলো। আবার যখন অপরাহ্ন যায় যায় তখন আমরা মথুরা ষ্টেশনে গিয়ে নামলুম।

মথুরা থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে বৃন্দাবন।

এই পথটুকু ট্রেণ, মোটর বাস, টাঙ্গা অথবা এক্কা গাড়ীতে যেতে হয়। ট্রেণের চেয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়াই আমাদের ভাল লাগলো। পীচ ঢালা নির্জ্জন পথ, দুধারে মাঠ আর বন, নানাজাতীয় বন্য ফুলের গন্ধে স্নিগ্ধ ও সুরভিত। তারি মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে আমাদের টাঙ্গা।

পথে সন্ধ্যা হলো, ধীরে ধীরে সমস্ত প্রকৃতি যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল অন্ধকারের রাজত্বে। রাস্তায় কোন সরকারী আলো নেই। একজন পথিকও নজরে পড়লো না। আমাদের চোখের সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু দিগন্তবিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। মাথার ওপরে আকাশ, তাতে লক্ষ লক্ষ তারার আলো। তারি অস্পষ্ট আলোতে মনে হলো যেন আমরা কোন স্বপ্নপুরীর মধ্য দিয়ে চলেছি!

আমাদের টাঙ্গা ছুটেছে—খুট্ খুট্ করে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে

যাচ্ছে বন থেকে বনান্তরে। কদাচিৎ দু'একটা ঘুঘুর ডাক, কখনো বা কেকাধ্বনি ভেসে আসছিল বহু দূর থেকে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে এই অদ্ভুত নীরবতা অনুভব করছি এমন সময় নাটকীয়ভাবে বন্ধু বললে, জানো এই সব বনে একদিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতেন!

সঙ্গে সঙ্গে দেহে একটা পুলকশিহরণ অনুভব করলুম। ছেলে-মানুষের মত বাতাসে কান পেতে রইলুম, যদি এখনো সেই বংশীধ্বনি শোনা যায়। মনে হ'লো তবে কি আমি বহু শত সহস্র বৎসর পেরিয়ে—বহু যুগ পার হয়ে এসে পৌঁচেছি সত্যি সত্যিই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে, সেই রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি মর্ত্ত্যের স্বর্গধামে!

রাত্রি নটা নাগাত আমরা গিয়ে পৌঁছুলুম বৃন্দাবনে।

আগে থাকতে আমাদের বাসা ঠিক ছিল। আমরা সেখানে উঠলুম। সারারাত্রি ভাল করে ঘুম হলো না উত্তেজনায়, সুতরাং পরদিন খুব ভোরেই আমাদের ঘুম ভাঙ্গল। মন্দিরে মন্দিরে তখন শাঁখ ঘণ্টা বাজছে - ঠাকুরের ঘুম-ভাঙ্গানি আরতির।

যমুনা দেখবার জন্য আমার মন আকুলি বিকুলি করছিল। বন্ধুকে বললুম—চলো, যমুনায় স্নান করে আসি।

সে বললে—এত সকালে?

আমি বললুম, আগে স্নান করে নিয়ে তারপর মন্দিরে মন্দিরে দর্শন করতে যাবো।

অবশেষে তাই হ'লো। কাপড় গামছা নিয়ে আমরা দু'জনে যমুনায় চললুম। ইট বাঁধানো পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে যমুনা পুলিনে। হাজার হাজার বছর আগে সেই পথ দিয়েই হয়ত গোপিনীরা যেত জল

আন্‌তে। তাদের চরণের অস্ফুট নূপুরধ্বনি যেন তখনও প্রতি ধূলিকণাতে অনুভব করা যায়।

যমুনা দেখে অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। বালির চর পেরিয়ে খানিকটা যাবার পর জল পেলাম—স্নিগ্ধ নীল কাকচক্ষুর মত। তবে বড় শীর্ণা, সবটাই বালির চড়া, মধ্যে সামান্য একটু জল, কিন্তু তাতেই স্নান ক'রে যেন সমস্ত দেহ মন জুড়িয়ে গেল। দলে দলে পুরবাসিনীরা এলো গান গাইতে গাইতে—স্নান করে তারা কলসী মাথায় করে চলে গেল। ঘাঘরা পরা, আঁট জামা গায়ে, অথচ বুকের নীচে থেকে নাভি পর্য্যন্ত দেহের সবটা উন্মুক্ত, মাথায় পাতলা উড়ুনী—বৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী, তরুণী, সকল বয়সের নারী। পুরুষকে দেখে তারা লজ্জা করে না, আমাদের সঙ্গে একত্রে স্নান করতে লাগল।

বন্ধুকে বললুম—ব্যাপার কি! বাঙ্গালী পুরুষদের কি এরা পুরুষ বলে মনে করতেও লজ্জা পায়?

সে বললে, না বৃন্দাবনে একজনকেই তারা পুরুষ বলে মনে করে—তিনি হলেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম, তবে এরাই কি সেই গোপিনী? এদের মধ্যে কি শ্রীরাধিকাও আছেন?

তারপর সমস্ত দিন ধরে মন্দিরগুলি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলুম।

বেশ লাগল জায়গাটি—যেমন নির্জ্জন তেমনি নিস্তব্ধ—কোলাহল নেই, জীবন সংগ্রামের জন্য মারামারি কাটাকাটি নেই। চারিদিকে একটা অবাধ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি—সবাই নিজ নিজ অবস্থা ও নিজ নিজ ভাগ্যেই যেন সন্তুষ্ট।

সুদূরের পিয়াসী

রোজ ভোরে উঠে স্নান ক'রে আমার ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগত। আমি একলা সমস্ত সকালটা ঘুরে বেড়াতুম। এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে আমি সন্ন্যাসিনীর খোঁজ করতুম। প্রতি গলিঘুঁজি, প্রতি মন্দির ঘাট, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তার কোন সন্ধান করতে পারলুম না। সেখানকার অতি পুরাতন বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা ক'রেও যখন তার কোন হদিশ পেলুম না তখন বুঝতে পারলুম সন্ন্যাসিনী আমায় মিথ্যা বলেছে।

এইভাবে প্রায় পনেরোদিন কেটে গেল।

আবার একদিন খুব ভোরে উঠে একাকী স্নান করতে গেলুম যমুনায়। আকাশে তখনো শুকতারা রয়েছে। স্নানার্থী নরনারীদের তখনো বিশেষ সমাগম হয়নি। দু-একজন ক'রে আসছে, দু'একজন ক রে চলে যাচ্ছে। শেষডুব দিয়ে উঠেছি এমন সময় আমার সামনে একটি রমণীকে দেখে চম্‌কে উঠলুম। তার মাথায় একটা কলসী, এবং একটু নীচু হ'য়ে সে আর একটা ছোট কলসী তারি ওপরে রাখবার চেষ্টা করছে! ছিপ-ছিপে নিটোল তার চেহারা, দুধে-আলতা রঙ, দীর্ঘ আয়ত দু'টি চোখে হরিণীর চঞ্চলতা।

আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে সে বললে, ভেইয়া,—কেয়া দেখ রহে হো!

অত মৃদু অথচ স্পষ্ট সে-কণ্ঠস্বর শুনে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন এক মধুর সুর বেজে উঠলো। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর ধীরে ধীরে বললুম—তুম্‌হে!

একটু মুচকি হেসে সে বললে—স্বচ্‌?

আমি বললুম—সত্যি বলছি তোমার মত সুন্দর মুখ আমি আর জীবনে কখনো দেখিনি।

সে হিন্দীতে বললে—রাধারাণীকে দেখোনি, বৃন্দাবনের যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ?

আমি বললুম—আগে দেখিনি, তবে এখন দেখছি তাকে আমার সামনে।

সে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললে—ছহি, তুম্ ঝুট বোলে হো।

এই বলে সে ধীরে ধীরে কলসী মাথায় নিয়ে চলে গেল। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম।

বন্ধুকে গিয়ে বললুম—আজ আমার বৃন্দাবনে আসা সফল হয়েছে, শ্রীরাধিকার দর্শন পেয়েছি।

বন্ধু একটু হেসে বললে—দেখা পেয়েছো ভালো, কিন্তু নিজে যেন আবার শ্রীকৃষ্ণ ব'নে যেয়ো না।

তার পরের দিন আবার খুব ভোরে উঠে যমুনায় গেলুম। আবার তার সঙ্গে দেখা হ'লো। এইভাবে প্রতিদিন যমুনায় স্নান করতে গিয়ে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল।

সে কথায় কথায় আমার কে আছে, কি বৃত্তান্ত, কোথায় বাড়ী, সমস্ত জেনে নিলে। আমি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে সে বললে—আমার কেউ নেই, আমি ব্রজবাসিনী, আমার নাম কৃষ্ণপিয়ারী।

তারপর থেকে আমি তাকে ডাকতুম পিয়ারী বলে। সে তাতে কোন আপত্তি করতো না।

কখন ভোর হবে এই চিন্তায় আমি রাত্রে ঘুমতে পারতুম না। পিয়ারীকে দেখবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকতো আমার সমস্ত মন। তার কুঞ্জ কোথায় জিজ্ঞেস করলে সে বলতো, অনেক দূরে। অথচ সঙ্গে

যেতে চাইলেও বিরক্ত হ'তো। তাই সমস্ত দিনের মধ্যে শুধু ওইটুকু সময়ের জন্য হ'তো আমাদের সাক্ষাৎ।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম—পিয়ারী, তোমার কি মনে হয় না যে রাতটা পোহালে বাঁচি?

সে ঈষৎ মুচকি হেসে বললে, বরং তার উল্টো,—রাত না কাটলে একটু তবু ঘুমিয়ে বাঁচি।

এই বলে সে চলে গেল।

এই ভাবে যত দিন যেতে লাগল ততই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগলুম। তার হাসি, তার চাহনি, তার মধুর কণ্ঠস্বর, তার বালিকাসুলভ চপলতা—আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, দিবারাত্র আমার মনে ঘুরে বেড়াতে থাকত।

সেদিন পূর্ণিমা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না যেন সহস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। রাত্রে বারে বারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল, বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হ'লো যেন ভোর হয়েছে—দু একটা পাখীও কোথা থেকে ডেকে উঠলো। আমি গামছা কাঁধে ক'রে যমুনায় যাবার জন্য পথে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু অনেক দূর চলে যাবার পর খেয়াল হ'লো পথঘাট একেবারে নির্জ্জন, কোথাও কোন লোকের সাড়াশব্দ নেই। মনটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো—তবে কি এখনো ভোর হয়নি!

এমন সময় ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজলো—দূরে কোন মন্দিরের ঘড়িতে। আমি থমকে দাঁড়ালুম। দেখলুম, একেবারে যমুনাপুলিনে এসে পড়েছি। কিন্তু যমুনার তীর জনশূন্য, মানুষের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

ভুল করেছি, এখন বাসায় ফিরে যাই তবে—এই মনে ক'রে যেমন পিছন ফিরেছি দেখি কলসী মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ারী। চোখে তার অদ্ভুত আনন্দের দীপ্তি, মুখে তার রহস্যময় হাসি।

চমকে উঠে আমি বললুম—একি, পিয়ারী! তুমিও কি রাত ভুল করেছো?

সে একটু মুচকি হেসে বললে—না ভুল করিনি।

বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলুম—তবে কি তুমি এত রাত জেনেও যমুনায় এসেছো?

সে আবার তেমনি ভাবেই উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

আমি বললুম, আমি যদি এখন এখানে না থাকতুম তাহ'লে ত তুমি বড় বিপদে পড়তে পিয়ারী?

একটুখানি হাসি চেপে সে বললে—আমি জানতুম তুমি থাকবে এখানে।

আমি তার আরো কাছে সরে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম—পিয়ারী, একথা কি সত্যি?

পিয়ারী কোন উত্তর না দিয়ে শুধু স্বপ্নবিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বললে—জানো, ঘুমতে ঘুমতে আমি আজ কি স্বপ্ন দেখেছি? দেখলাম যেন গোবিন্দজী আমায় ডাকছেন; আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলুম, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ গোবিন্দজী কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় দেখলুম তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছো। ঠিক তাঁরই মতন তোমার এই কালো রূপ—কালো গভীর চোখ, দীর্ঘকুঞ্চিত কেশ।

এই বলে সে থামলো।

সুদূরের পিয়াসী

গান থেমে গেলে যেমন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুরের রেশ থাকে তেমনি পিয়ারী চুপ করবার পর তার কণ্ঠস্বরের মৃদু কম্পন বহুক্ষণ আমি অনুভব করতে লাগলুম আমার অন্তরের মাঝে, দেহের প্রতি শিরায় উপশিরায়। এ কথার উত্তরে কি কথা তাকে বলবো, খুঁজে পেলুম না। কখন যে অজ্ঞাতে তার হাতখানা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছি তাও মনে নেই, কিন্তু চমক যখন ভাঙ্গল তখন আর তা ছাড়লুম না, শুধু তার ফুলের মত নরম হাতখানিকে হাতের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নির্জ্জন যমুনা-পুলিনে। কারো মুখে কোন কথা ছিল না। দু'জনে যেন শুধু দু'জনের সান্নিধ্য উপভোগ করছিলুম নিঃশব্দে।

ভোর হ'তেই যমুনায় আবার লোকজন আসতে শুরু হ'লো।

আমরা স্নান ক'রে অগ্রসর হলুম বাসার দিকে। পথে চলতে চলতে পিয়ারীকে বললুম—আজ আমি কোন কথা শুনবো না, তোমাকে মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

সে আমায় অনুনয় ক'রে বললে—তোমার পায়ে পড়ি, আমার সঙ্গে যেয়ো না।

আমি আর জোর করলুম না। একাকী বাসায় ফিরে গেলুম। আর কেন যে সে আমায় সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যেতে চায় না, তার একটা গোপন অর্থ বার করে বোধকরি খুশীই হয়েছিলুম।

কিন্তু আশ্চর্য্য! পরের দিন যমুনায় গিয়ে দেখলুম পিয়ারী নেই! তার পরের দিনও তাকে দেখতে পেলুম না। সেখানে নিয়মিত সময়ের বহু আগে থেকে আমি গিয়ে ঘাটে বসে থাকি, অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি, তবুও তার দেখা পাই না।

কি হ'লো, তবে কি আমার ওপর পিয়ারী রাগ করলে? আমি কি

সেদিন রাত্রে তাকে অপমান করেছি? তার সম্ভ্রম, তার পবিত্রতা কি নষ্ট হ'য়েছে আমার অন্তরের লুব্ধ আকর্ষণে! কিংবা আমার মুখে চোখে যে লালসার ছবি ফুটে উঠেছিল তাই দেখে সে ভয় পেয়েছে? এই সব মনে তোলাপাড়া করতে করতে আমি সকাল দুপুর সন্ধ্যা, সকল সময় ঘুরে বেড়াতুম যমুনাপুলিনে।

এমনি করে পনেরো দিন কেটে গেল। পিয়ারী আমায় ত্যাগ করেছে, কেমন ক'রে জানি না এই ধারণা আমার মনে তখন দৃঢ় হ'য়ে উঠলো।

এদিকে আমাদের দু'মাস সময় ফুরিয়ে গেল। একদিন বন্ধু বিছানা-পত্তর বেঁধে বৃন্দাবন ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। রাত্রি সাতটায় গাড়ী। আমি ভোরে উঠে যথারীতি স্নানটা সেরে নিলুম, তারপর শেষবারের মত গোবিন্দজীকে দর্শন করবার জন্য মন্দিরে গেলুম।

তখনো ভাল করে লোকজন আসেনি। প্রভাতের প্রথম আলোয় মন্দিরের লাল পাথরে একটা অদ্ভুত আলো-ছায়ার খেলা চলেছে। মন্দিরে ঢোকবার পথেই কে জানে কেন মনে কেমন নেশা লেগেছিল। তার ওপর ভেতরে ঢুকেই প্রথমে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো তা জীবনে ভুলতে পারবো না।

মূল মন্দিরের প্রবেশ পথে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে বসে আছে একটি রমণী বিগ্রহের দিকে চেয়ে। তার দেহের আর কোন অংশ নড়ছে না, শুধু কুসুমপেলব শুভ্র অনাবৃত একটি হাত ছাড়া। বাম হাতের ওপর ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে বসে ডান হাতে সে টানাপাখার দড়িটি ধরে গোবিন্দজীকে বাতাস দিচ্ছে, আর মৃদু অথচ মধুর কণ্ঠে গান গাইছে—"ম্যেরে তো গিরধারী গোপাল আউর

দুস্‌রা ন কোই।” দেবসেবার সে-মূর্ত্তি কোন বাঙ্গালীর পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমি শুধু তার দিকে চেয়ে রইলুম, সামনে গেলুম না পাছে তার ধ্যান ভেঙ্গে যায়, পাছে সে ছবি আর আমি দেখতে না পাই। তাকে দেখে আমার মনে হ'তে লাগল, সে যেন দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃত একটি চামেলী ফুল, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ! সে যেন এ পৃথিবীর নয়—এ মাটির সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই।

কিছুক্ষণ পরে গান থামলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে গোবিন্দজীকে প্রণাম করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যেমন পিছন ফিরেছে অমনি আমি চম্‌কে উঠলুম। একি! এযে পিয়ারী!

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল; কেমন ক'রে সেই পবিত্র মূর্ত্তির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবো, এবং কি ক'রে তার সঙ্গে কথা বলবো—তাই ভেবে আমি ইতস্তত করতে লাগলুম।

কিন্তু আমি কোন কথা বলবার আগেই সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, তারপর সলজ্জ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে বললে—দর্শনমে আয়া?

আমি বললুম—হ্যাঁ, আজ আমরা দেশে চলে যাবো কি না তাই শেষ দর্শন করতে এলুম।···তারপর একটু থেমে বললুম, ভালই হ'লো তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল গোবিন্দের কৃপায়।

নিমেষে তার মুখে চোখে একটা বিষাদের ছায়া ফুটে উঠলো। তারপর আবার জোর ক'রে যেন মুখে হাসি টেনে এনে কৈফিয়ৎ দেবার সুরে আমাকে সে বললে—আমি এতদিন বাড়ী থেকে একেবারে বেরুতে

পারিনি, পূজারী-ঠাকুরের ভয়ানক অসুখ করেছিল কিনা। দিনরাত তাঁকে সেবা করতে হ'য়েছে।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—কেন, তাঁর কি এখানে আর কেউ নেই ?

পিয়ারী একটুখানি থেমে ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

তারপর ধীরে ধীরে সে বললে—পনেরো দিন পনেরো রাত আমাকে সমানে জাগতে হয়েছে। এক মিনিটের জন্যে বাড়ী থেকে বার হতে পারিনি। আজ প্রথম এই মন্দিরে এসেছি।

আমি বললুম—যদি তোমার বাসাটা চিনতুম তা'হলে হয়ত একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে পারতুম, এবং রোগীর সেবা করা থেকে তোমায় খানিকটা অবসর দিতে পারতুম। আর তা ছাড়া তোমায় এতদিন বৃথা চারিদিকে আমায় খুঁজে বেড়াতে হতোনা।

মুখে চোখে এক অদ্ভুত হাসি টেনে এনে পিয়ারী বললে—তাহ'লে আমায় খোঁজবার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, কি বলো ? আচ্ছা, যাতে আর কষ্ট করতে না হয় তার ব্যবস্থা এখনি করছি—চলো আজ তোমাকে আমার বাসাটা দেখিয়ে দিই।

আমি বললুম—কিন্তু আর দেখিয়ে লাভ কি, এখন ত আর তোমার কোন উপকারে আসতে পারবো না।

এখন না পারো ভবিষ্যতে ত পারবে ? এই বলে সে অদ্ভুত হাসিমাখা তার আয়ত চোখ দু'টি তুলে আমার চোখের ওপর রাখলে।

বললুম, কিন্তু আজই যে আমি চলে যাচ্ছি পিয়ারী—

আজ যাচ্ছো, আর কি কখনো আসবে না বৃন্দাবনে ?

উৎসাহিত হয়ে বললুম—নিশ্চয়ই! চলো তবে বাসাটা দেখে আসি ভালো করে।

গোপীনাথের ঘেরার কয়েকটা সরু গলি পেরিয়ে আমরা এক অতি নির্জ্জন স্থানে এসে হাজির হলুম। পাঁচলীঘেরা ছোট একটা বাগান, তারি মধ্যে রাধাগোবিন্দের একটি ছোট মন্দির। মন্দিরের সাম্‌নে একফালি উঠোন, উঠোনের ওপারে ছোট ছোট চারখানি ঘর। পিয়ারী আমায় সঙ্গে করে একে একে সব দেখাতে লাগল। ঘরগুলির সামনে এসে বললে—একটায় আমি থাকি, একটায় পূজারী-ঠাকুর, একটায় ঝি-চাকররা। তারপর শূন্য ঘরটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে—এটা অতিথিশালা, কোন লোকজন এলে এইখানে থাকে।

আমি বললুম—অতিথিদের এখানে থাকবার কি কোন নিয়ম-কানুন আছে?

সে বললে—না।

তবু তারা কতদিন পর্য্যন্ত এখানে থাকতে পারে?

সে বললে, যতদিন ইচ্ছা। অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম।

আমি বললুম,—ধর যদি আমি আসি অতিথি হয়ে?

পিয়ারী ছোট একটা হাসি চেপে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, তাহলেও ওই নিয়ম। তবে একজনের বেশী থাকবার জায়গা ত এখানে নেই; আগেই যদি কোন অতিথি এসে পড়ে তবে তোমায় ফিরে যেতে হবে।

এই বলে পিয়ারী দ্রুত ও লঘু চরণে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

প্রভাতের সোনালী রোদে সেই স্থানটী এমন অনির্ব্বচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কোন তপোবনে এসেছি।

সেখানকার ঘরবাড়ী, গাছপালা, রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ—এই সমস্তর মধ্যে যেন আনন্দ ও শান্তি একত্রে জড়িয়ে রয়েছে, আর পিয়ারী যেন তাদের প্রাণস্বরূপিণী। এই ত বৃন্দাবনের প্রকৃত রূপ!

মনে মনে এইসব চিন্তা করতে করতে আমি ফিরে এলুম বাসায়। বিকেল হ'লো। বন্ধু একটা গাড়ী ডেকে আনলে; তারপর জিনিসপত্র বোঝাই করে মাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। আমি বিছানাটা আগেই গাড়ী থেকে নামিয়ে রেখেছিলুম। বন্ধু তাই দেখে বিস্মিত হয়ে আমায় প্রশ্ন করলে—যাবিনা? আমি বললুম—না ভাই, গোবিন্দের কৃপায় একটা চাকরী পেয়ে গেছি—খবরটা আমার খুড়ো খুড়ীকে দিয়ে দিস্।

বন্ধু একটু হেসে বললে—ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে এসেছিলি তাইত চাকরী পেলি।

আমি বললুম—ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ তার জন্যে।

তাদের গাড়ী ছেড়ে দিল। পশ্চিমী ঘোড়াটী তখন গলার ঘুঙুর বাজিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো।

আমার সেই একমাত্র বিছানাটী বগলে করে আমি ধীরে ধীরে পিয়ারীর মন্দিরের দিকে রওনা হলুম।

সন্ধ্যা তখনো হয়নি। গোধূলির আলোয় সবে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি বিছানাটী বগলে ক'রে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলুম।

পিয়ারী তখন ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা-আরতীর আয়োজনে ব্যস্ত। তবু একবার পিছন ফিরে আমায় দেখলে। তারপর নেহাতই অপরিচিত অতিথির মত সেইখান থেকে চাকরকে ডেকে অতিথিশালাটা খুলে দিতে বললে। আমি বিছানাটা ঘরে রেখে, জামা খুলে, মুখহাত পা ধুতে ধুতেই আরতির বাজনা বেজে উঠল।

সুদূরের পিয়াসী

ভোগ ও আরতি শেষ করে পিয়ারী যখন ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তখন রাত্রি প্রায় নটা। আমি একটা খাটিয়ায় শুয়েছিলুম। পিয়ারী একটা থালায় ক'রে পুরী মিঠাই ও রাবড়ী নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর স্নিগ্ধ ও মধুর কণ্ঠে ডাকলে—বাবুজী ?

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। এতক্ষণ যেন আমার সমস্ত অন্তর সেই ডাকটী শোনবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পিয়ারীকে দেখে আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। তাকে এমন অদ্ভুত বেশে আমি আর কোনদিন দেখিনি। বাঙ্গালীর মেয়ের মত পাতলা একটা রঙ্গীন সাড়ী সে পরেছিল, তাঁর মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে তার কাঁচা সোণার মত দেহের রঙ, অপ্রশস্ত ললাটে সিঁদুরের একটী ছোট টিপ, খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো। মুচকি হেসে সে বললে—বাবুজী, তুমি দেশে গেলে না ?

আমি বললুম—না, বিনা খরচায় যদি থাকা এবং এই রকম রাজভোগ খাওয়া যায়, বিশেষ ক'রে যতদিন ইচ্ছে, তাহলে দেশে গিয়ে খুড়োর গলগ্রহ হ'য়ে লাভ কি ?

পাখার বাতাস দিতে দিতে পিয়ারী বললে—সত্যিই কি শুধু থাকা আর খাওয়ার জন্যে তুমি এখানে এলে ?—আমি খেতে খেতে মুখ তুলে তার চোখের দিকে চাইতেই দেখলুম অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বললুম—না, শুধু তোমায় দেখবো বলে, দিনরাত সকল সময়ে দেখবো ব'লে এখানে এলুম পিয়ারী !

তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বাঁকা হাসি টেনে এনে সে বললে—এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। তাহলে তুমি আজ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যেতে চাইতে না।

সুদূরের পিয়াসী

আমি বললুম—বিশ্বাস করো পিয়ারী, আজ সমস্তদিন ধরে ভেবে ভেবে শুধু এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, তোমায় ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

তোমায় আর একটু রাবড়ী এনে দিই—এই বলে পিয়ারী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; এবং আমার পেট ভরে গেছে বলা সত্ত্বেও জোর করে আর একটু রাবড়ী এনে পাতে ঢেলে দিতে দিতে বললে—আমায় যদি কেউ এরকম ক'রে অনুরোধ করতো ত মরে গেলেও আমি 'না' বলতে পারতুম না।

তারপর বিছানা ক'রে আমাকে শুইয়ে মশারী ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা টেনে দিতে দিতে পিয়ারী বললে—নতুন জায়গায় যদি ভয় করে ত আমায় ডেকো। এই বলে সে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলুম অদ্ভুত ছেলেমানুষের হাসি।

ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় দুম্ দুম্ করে দরজায় কে ঘা দিলে। চমকে উঠে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললুম—কে?

ডরো মৎ ম্যয় কৃষ্ণপিয়ারী হুঁ।—বলতে বলতে সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই দেখি, পিয়ারী কাঁকে কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললে—চলো যমনামে আস্নান্ ক্যরনে!

তখনো আকাশে তারা রয়েছে, অন্ধকার ফিকেও হয়নি। আমি কোন কথা না বলে গামছাটা নিয়ে তার পিছু পিছু চললুম।

ভাল করে ভোর হবার পূর্ব্বেই স্নান করে আমরা যমুনা থেকে ফিরে এলুম। তারপর একখানা সাদা সাড়ী পরে, ভিজে চুল পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে, চন্দনের একটি ছোট্ট টিপ ধনুকের মত বাঁকা দু'টি ভ্রূর মধ্যে

এঁকে, একটা সাজি হাতে নিয়ে পিয়ারী আমার ঘরে এসে হাজির হ'লো। বললে, চলোগো ফুল চুনে ?

তার সে মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমি আর না বলতে পারলুম না ! গেলুম তার সঙ্গে ফুল তুলতে। আমি গাছের ডাল নীচু করে ধরি আর পিয়ারী ফুল তোলে ! এইভাবে এক সাজি ফুল নিয়ে আমরা মন্দিরে ফিরে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমায় তার ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিয়ারী বললে—মালা গাঁথতে জানো ?

ইতিপূর্ব্বে কোনদিন মালা গাঁথিনি, তবুও পাছে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হয় তাই বললুম—হাঁ জানি। পিয়ারীর সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য তখন আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে ছিল। যত তাকে কাছে পাই ততই যেন তাকে পাবার মোহ আমার আরো বেড়ে যায়। আমি বসে বসে ফুলের বোঁটা খুলে দিতে লাগলুম আর পিয়ারী মালা গাঁথতে লাগল।

এইভাবে ধীরে ধীরে পিয়ারী তার প্রতি কাজে আমায় সাথী করে নিতে লাগল। বোধহয় সে আমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিল।

মাস দুয়েক কেটে যাবার পর আমি দেখলুম আমার সতন্ত্র সত্তা বলে কিছু আর নেই, পিয়ারীর ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা, তারই আনন্দে আমার আনন্দ !

কি জানি কেন প্রথম দিন থেকেই পূজারী-ঠাকুরটিকে আমার ভাল লাগে নি। তার প্রতি আমার যেন অহেতুক একটা বিদ্বেষ ছিল। তিরিশের কাছাকাছি তার বয়স, সৌম্য, শান্ত, দিনরাত এমন ভালমানুষটি সেজে থাকতো যেন পৃথিবীর কোন কিছুই সে জানে না।

সুদূরের পিয়াসী

পিয়ারী বলতো, পূজারী-ঠাকুর কঠোর ব্রহ্মচারী, পূজায় ও ধর্ম্ম কর্ম্মে তার ভারী নিষ্ঠা।

আমি বলতুম, ও ভণ্ড।

এই নিয়ে পিয়ারীতে আমাতে প্রায়ই বচসা হতো।

পিয়ারী বলতো, ওকে ভণ্ড বললে তোমার পাপ হবে জানো? ও সংসার ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে, গোবিন্দের সেবায় মন উৎসর্গ করেছে! ক'টা লোক বাপ-মা স্ত্রীকে ছেড়ে—সংসারের সমস্ত বন্ধন কেটে এ পথে আসতে পারে, গোবিন্দের প্রতি যদি তার একান্ত অনুরাগ না থাকে?

আমি বললুম, তোমার মত সেবাইত পেলে ওরকম একটা কেন, শত শত পুরুষ ঘর ছেড়ে গোবিন্দের পায়ে মন উৎসর্গ করতে পারে। পিয়ারী, কোনদিন কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখেছো, দেখেছো কি, কি সর্ব্বনাশী রূপ তোমার?

চুপ্! ব'লে তাড়াতাড়ি পিয়ারী একটা হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলে। তারপর মৃদু ভৎসনার স্বরে বললে, ভারী দুষ্টু তুমি। এই বলে হরিণীর মত চঞ্চল চরণে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল।

মনটা খুব উত্তেজিত হয়েছিল। তাই অনেকদিন ধরেই যে কথাটা বলবার সুযোগ খুঁজছিলুম একটু পরে পূজারীঠাকুরকে মন্দিরের মধ্যে একা পেয়ে সেই কথাটা বলে ফেললুম—পূজারীজী, যে রমণীকে একদিন অগ্নি ও নারায়ণকে সাক্ষী করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাকে ফেলে রেখে এসে এই ব্রহ্মচারী সাজার মানে কি?

আমার মুখের দিকে না চেয়ে অতি ক্ষীণকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, কি করবো, গোবিন্দকে ছেড়ে যে আমি একমুহূর্ত্ত থাকতে পারি না। গোবিন্দ আমার ধ্যান! গোবিন্দ আমার জ্ঞান!

আমি বললুম—মিথ্যে কথা! গোবিন্দ আপনার ধ্যান নয়, জ্ঞানও নয়, পিয়ারীই আপনার ধ্যান ও জ্ঞান।

আমার কণ্ঠস্বর শুনে কি না জানি না পূজারীঠাকুর চমকে উঠলেন তারপর তাড়াতাড়ি তাঁর দু'কানে হাত চাপা দিলেন।

আমি আবার প্রশ্ন করলুম—সত্যি করে বলুন দেখি, পিয়ারীকে চোখে দেখবার আগে পর্য্যন্ত আপনার স্ত্রীকে নিয়েই সুখী হয়েছিলেন কিনা?

—না, হ্যাঁ, অনেকটা ওইরকম—তবে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে—পূজারী-ঠাকুর ভাল করে উত্তর দিতে না পেরে ওই ভাবে একটা কি জড়িয়ে জড়িয়ে বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এমন সময় পিয়ারী এসে পড়লো।

আমিও আর কোন কথা না বলে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম।

একদিন ফুল তুলতে গিয়ে পিয়ারীকে বললুম—একজন বুড়ো দেখে পূজারী ঠিক্ করো, যুবক পূজারীদের মন বড় চঞ্চল, ঠাকুরের দিকে মন তাদের সম্পূর্ণরূপে যায় না। ফলে যার বিগ্রহ তার অকল্যাণ হয়, এবং নানারকম অশান্তি দেখা দেয় সংসারে।

একটু হেসে পিয়ারী বললে—তার চেয়ে স্পষ্ট ক'রে বলোনা কেন যে তোমার হিংসে হয় তাকে দেখে।

আমি বললুম, সেটা হওয়া কি অস্বাভাবিক ?

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী গম্ভীর হয়ে গেল এবং বললে, এখানে কি মনে করলেই পূজারীঠাকুর পাওয়া যায়? তাহলে ত ভাবনাই ছিল না।

আমি বললুম, আচ্ছা সে ভার আমার।

পিয়ারী বললে, তখন দেখা যাবে, এখন যা করছো তাই করো।

সুদূরের পিয়াসী

অনেক খুঁজে খুঁজে একমাস পরে আমি মথুরা থেকে একজন বৃদ্ধ পূজারীকে জোগাড় করে নিয়ে এলুম। অতি সদ্‌ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, আজীবন দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন; সুপণ্ডিত ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য বিখ্যাত।

তাঁকে দেখে পিয়ারীর মুখ শুকিয়ে গেল। সে নানারকম বাজে ওজর দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বরখাস্ত করে দিলে।

মনটা আমার ভারী খারাপ হয়ে গেল।

পূজারীঠাকুর যখন সন্ধ্যাবেলায় যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন এবং পিয়ারী ঠাকুরঘরে একাকী বসে আরতির জোগাড় করছিল সেই সময়ে নিঃশব্দে আমি পিয়ারীর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, পিয়ারী এর মানে কি?

কিসের মানে? পিয়ারী আমার মুখের দিকে না চেয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—আমি যে পূজারী-ঠাকুরকে মথুরা থেকে নিয়ে এলুম তাকে তুমি তাড়িয়ে দিলে কেন?

—আমি মেয়েমানুষ, একা যার সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতে হবে তাকে না জেনেশুনে কেমন করে রাখি বলো। তোমরা পুরুষ, তোমরা কথাটা যত সহজে বলতে পারো, আমাদের পক্ষে ততটা সহজে তা নেওয়া অসম্ভব।

আমি ওকথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললুম—পিয়ারী একটা কথা আজ সত্যি করে বলবে?

আমার কথা শুনে পিয়ারীর মুখ চোখ যেন নিমেষে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তারপর জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করতে করতে অস্ফুটকণ্ঠে বললে—বলো।

আমি বললুম, এই বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বলো দেখি, তুমি পূজারী-ঠাকুরকে ভালবাস কিনা।

পিয়ারীর মুখচোখ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বিগ্রহের দিকে চেয়ে থেকে বললে—তবে শোন বাবুজী, কথাটা একদিন আমি নিজেই তোমাকে বলবো ভেবেছিলুম, কিন্তু আজ যখন তুমি জিজ্ঞেস করলে তখন আর কোন কথাই তোমার কাছে গোপন করবো না।

এই বলে সে আরম্ভ করলে,—তোমারই মত একদিন এই পূজারীঠাকুর আমায় ভালবেসেছিল, শুধু চোখের দেখার জন্যে দিনরাত পাগলের মত আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো। পাশাপাশি বাড়ীতে আমরা বাস করতুম, খুবই ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দ্য ছিল আমাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের। তারপর এক বিহ্বল-করা পূর্ণিমার রাতে হলো আমার মরণ। শুধু মুহূর্ত্তের ভুলে, শুধু এক লহমার অসংযমে আমার সমস্ত মান সম্ভ্রম শিক্ষা দীক্ষা যেন কোন রাক্ষসী মায়ামন্ত্রে হরণ ক'রে নিলে···সে একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, পরের দিন সকালে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার কাছে কুৎসিত হ'য়ে উঠল, স্বামী ও পুত্রের কাছে আমার মুখ দেখাতে ঘৃণা বোধ হতে লাগল। তাই চুপি চুপি সেইদিন রাত্রেই বৃন্দাবনে পালিয়ে এলুম। পূজারী-ঠাকুরও চলে এলো আমার সঙ্গে। বললে, মুহূর্ত্তের ভুলে আমরা যে পাপ করেছি, সারাজীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে। সেই থেকে আট বছর কেটে গেছে।

এই ব'লে পিয়ারী চুপ করলো।

তার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপছিল বলে মনে হ'লো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বললুম, পিয়ারী মুহূর্ত্তের ভুলকে সারাজীবন ধরে বহন ক'রে তোমরা ভগবানের কাছে আরো বেশী অপরাধী হ'য়েছো। মুহূর্ত্তের ভুলকে মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে যদি তোমরা দু'জনে দু'জনের পথে চলে যেতে, তাতে নিশ্চয়ই ভগবান বেশী খুশী হ'তেন। ভুল ভ্রান্তি নিয়েই ত মানুষের জীবন, তা নাহ'লে মানুষকে ভগবান মানুষ ক'রে সৃষ্টি করতেন না। তাদের দেবতা করতেন।

তারপর বললুম—পিয়ারী দেববিগ্রহ নিয়ে ছেলেখেলা করোনা; দেবতার পবিত্র মূর্ত্তিকে সামনে রেখে এই যে প্রেমের অভিনয়, এর নাম আত্মপ্রবঞ্চনা—এ পাপ! সহস্রজীবন নরকবাস করলেও এ থেকে উদ্ধার পাবে না, স্থির জেনো। এই বলে আমি তৎক্ষণাৎ মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলুম।

পিয়ারী পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল।

পর দিনই আমি বিছানাপত্তর বেঁধে প্রস্তুত হ'লুম, দেশে চলে আসবো বলে। রাত্তিরে গাড়ী; সন্ধ্যায় বেরুবার উদ্যোগ করছি এমন সময় পিয়ারী এসে আমার ঘরে ঢুকলো। সমস্ত দিন তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে আমায় বললে—তুমি চলে যাচ্ছো?

আমি বললুম, হ্যাঁ, এর পরেও কি আমায় থাকতে বলো?

ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে পিয়ারী উত্তর দিলে, হয়ত বলতুম কিন্তু এখন আর বলবার ইচ্ছে নেই।

ইচ্ছে নেই, না বলবার মত কিছু নেই,—কোনটা সত্যি?—আমি একটু খোঁচা মেরেই তাকে প্রশ্ন করলুম।

পিয়ারী বললে—সত্যি এর কোনটাই নয়। সত্যি হচ্ছে এই যে, সব পুরুষরাই নারীর কাছ থেকে একই জিনিষ চায়।

আমি বললুম, ভুল, পিয়ারী ভুল—সব পুরুষ সমান নয়, নিশ্চিত জেনো।

তাই যদি হবে, তবে তুমি আজই চলে যাচ্ছো কেন? পিয়ারীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

তার সে মুখের দিকে চেয়ে বুকটা যেন হঠাৎ দুলে উঠল, তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে বললুম, তোমার মনে আর আমার স্থান নেই, সবটুকু মন তুমি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছো অন্যকে, এইটুক জানতে পেরেই আজ আমি এখান থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছি। তা না হ'লে ভেবেছিলুম বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবো।

পিয়ারী বললে, তুমি যা জেনেছো তা সম্পূর্ণ ভুল। আমি যদি বলি, ও মন ছাড়া আর একটা এমন মন আমার আছে যেখানে তোমার আসন অচল অটল—তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?

আমি বললুম, না, ওটা একেবারে মিথ্যা, মেয়েমানুষের ভণ্ডামী।

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারীর সুন্দর মুখে কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিলে, দুই চোখে মুহূর্তের জন্য যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, মনে হ'লো কী যেন একটা রূঢ় কথাই সে বলতে গেল, কিন্তু প্রাণপণে মনের ভাব দমন ক'রে বললে, পিয়ারী কোনদিন তোমায় মিথ্যা বলেনি, একদিন জানতে পারবে।

এই বলে চোখের জল চাপতে চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানাপত্তর একটা গাড়ীতে বোঝাই ক'রে মথুরা ষ্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলুম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যেতে এক্কায় লাগে দু'ঘণ্টা। কিন্তু এই সময়টা সেদিন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ—ফুরোতে চায় না। যে পথে আসবার সময় এত আনন্দ পেয়েছিলুম প্রত্যাবর্ত্তন কালে তা আমার কাছে অত্যন্ত ক্লান্তিকর, উৎসাহহীন ও যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হচ্ছিল। একই পথ তার গাছপালা, ফাঁকা মাঠ, নির্জ্জনতা নিয়ে তেমনি করেই আমার মুখের দিয়ে চেয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তাদের অচেনা—আমি তাদের আগে কোন দিন দেখিনি, একটা অস্পষ্টতার ও অনাত্মীয়তার কুহেলী যেন তাদের সর্ব্বাঙ্গে। তারা যেন আমায় চিনতে চায় না, ধরাছোঁয়া দিতে চায় না, আমি তাদের অযোগ্য!

খুট্ খুট্ ক'রে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছিল বন থেকে বনান্তরে। আমি চুপ করে তাই শুনছিলুম আর ভাবছিলুম কত রকমের নারী এলো আমায় জীবনের পথে এই কদিনে। ঘর ছেড়ে মাত্র চার বছর পথে বেরিয়েছি কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে লোক যা দেখতে না পায় আমি বাইরে এসে তার চেয়েও বেশী পেয়েছি। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই!

পুরুষের বিস্ময় এই নারী! ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি! যেন খেয়াল খুশীর একটা পুঞ্জীভূত উচ্ছ্বাস! নব নব রূপ, নব নব ঐশ্চর্য্য নিয়ে তারা এসে দাঁড়ায়, আমার সামনে। কি তারা চায়, কি তারা পায়, কি তাদের কাছে সত্য বুঝতে গিয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হয়! তীরে দাঁড়িয়ে দিক-রেখাহীন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনের ভিতরটা যেমন করে ওঠে—হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে যেমন

দিশাহারা হয়ে যাই, কোথায় তার শুরু, আর কোথায় শেষ খুঁজে পাইনা, তেমনিই আমার মনে হয় এক একটি নারীর দিকে চেয়ে! সামান্য মানুষ কিন্তু কী অসামান্য তাদের ক্ষমতা। এই যাকে ভাবি পেয়েছি বলে, পর মুহূর্ত্তে দেখি সে ত নেই। আবার যাকে কখনো পাইনি মনে করে দুঃখ করি, দেখি না, তাকেই ত সত্যি পেয়েছি। এই জন্যই কী ঋষিরা নারীকে কেউ বলে মায়া, কেউ বলে ছায়া, আবার কেউ বা বলে মরীচিকা? মনে সংশয় জাগে। দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে বাস্তবতার ঝগড়া লাগে। কে এক্ষেত্রে প্রকৃত জয়ী হয় বলতে পারি না। তবে মনে হয় ছায়া কায়া থেকেই আসে, মায়া ত মানুষই সৃষ্টি করে। আর মরীচিকা—সেও ত সত্যেরই প্রতিফলিত রূপ। বাস্তব থেকে যার উৎপত্তি সে বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুল থেকেই গন্ধ আসে তাই তা সত্য। বিজলীর আলো ক্ষণিক হলেও তা সত্য। এবং তাই তা এত সুন্দর তার রূপের তুলনা মেলে না পৃথিবীতে। আর সেই জন্যই বোধহয় কবির লেখনী নারীর জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে, শিল্পীর তুলি নারীর রূপ রেখায় বাঁধতে গিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

বাল্যকাল থেকে আমার মনে হতো রমণীর মাঝে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বাসা বেঁধেছে। এ রূপ যে দেখতে পায় সে ভাগ্যবান। তাই তার হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ভালবাসা ও প্রত্যাখ্যান দুই আমার কাছে ছিল সমান প্রিয়। সুন্দরের সব কিছুই আমার সুন্দর বলে মনে হতো।

সেদিন বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসতে আসতে কেবলই আমার এই কথা মনে হতে লাগল যে আর বাড়ীতে ফিরবোনা, শুধু ঘুরে বেড়াবো পথে পথে, দেখবো পৃথিবীর যেখানে যত রমণী আছে সবাইকে!

এমনি করে ভাবতে ভাবতে যখন মথুরা ষ্টেশনে এসে পৌছলুম তখন

অপরাহ্ন উত্তীর্ণপ্রায়। এক্কাওলাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ষ্টেশনের ঘরের কাছে যেতেই দেখি যাত্রীরা সব মালপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এখুনি গাড়ী আসবে।

তাড়াতাড়ি পয়সা বার করতে করতে টিকিটের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু বিপদ হলো এইবার। কোথাকার টিকিট কাটবো? ইতস্ততঃ করছি—এমন সময় কোথা থেকে একটী বাঙ্গালী মহিলা এসে বললেন, হ্যাঁ ভাই, তুমি কোথায় যাবে?

তাইত—কি উত্তর দিই। মিনিটখানেক ভেবে, গোটাদু'চার ঢোঁক গিলতেই সেই মহিলাটি আবার বললেন, হরিদ্বারে, কুম্ভমেলায় ত?

চট্ করে বললুম, হ্যাঁ।

কুম্ভমেলার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। শুনেছিলুম এতবড় যোগ নাকি পঞ্জিকাতে আর নেই। বারোবছর অন্তর একবার করে এই পুণ্য তিথিটি আসে। ভারতবর্ষের সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই এমন কি যাঁরা সুদূর পর্ব্বতগুহায় বসে কঠোর তপস্যা করেন তাঁরা পর্য্যন্ত আসেন এই উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করতে। দুর্ল্লভ সুযোগ! জীবনে আর আসবে কিনা সন্দেহ!

তাই সে মহিলাটির তিনখানি টিকিট কেটে দিয়ে আমিও একখানা হরিদ্বারের কিনে ফেললুম। মন্দ কি, ঘুরেই আসা যাক না দিনকতক, যখন সঙ্গী পেলুম!

টিকিটগুলি হাতে নিয়ে মহিলাটি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে কিনা জানি না বললেন, হ্যাঁ ভাই তোমার সঙ্গে কি আর কেউ নেই?

আমি বললুম, না।

তখন তিনি একটু হেসে বললেন, ভালই হ'লো তোমাকে তাহ'লে

আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—না বললে শুনবো না—আমি তোমার দিদি হই।

আমি বললুম, আপনাদের সঙ্গে কি কোন পুরুষ নেই?

তিনি বললেন, আছে, তবে তাকেই দেখতে হয় আমাদের! এই বলে প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একজন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই দেখ আমি একজন ভাই পেয়েছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ভাই ইনিই তোমার দাদাবাবু হন। আর তাঁর পাশে যে অপর একজন বিধবা মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, উনি আমার বড় ননদ, তোমার বড়দিদি হন।

আমি হাত জোড় করে উভয়কেই নমস্কার করলুম।

ননদটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভায়ের দিকে চেয়ে অনুচ্চস্বরে কি বলতে লাগলেন আমি শুনতে পেলুম না, তবে তার মধ্যে থেকে একটা কথা আমার কানে ভেসে এলো—ছোট-বৌয়ের যেমন, কোথাকার কে এক ছোঁড়াকে এনে অমনি ভাই বলে গলে পড়লো।

তাঁর স্বামীও কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছিলেন। এঁদের আমার ভাল লাগল না। তাই 'আচ্ছা এখন আসি' বলে সকলের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে একবার কপালে ঠেকিয়ে যেমন দু'পা চলে এসেছি অমনি পেছনদিক থেকে এসে দিদি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, যেয়োনা ভাই, এখুনি গাড়ী আসবে যে।

বাঙ্গালীর মেয়ে যে এত সপ্রতিভ হতে পারে তা আমার ধারণারও বাইরে ছিল। আমি যে পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েছি সেখানকার মেয়েরা চোদ্দ বছরের ছেলেকে দেখলেই ঘোমটা টেনে দেয়। দেওর, ভাশুর-পো, স্কুলের পোড়ো—কোন সম্পর্ককেই বিশ্বাস করে না। পুরুষ মাত্রকেই

তাদের সন্দেহ! শুনেছি এখন নাকি সব দেশেই এই পর্দ্দা প্রথটা অনেকটা কমেছে কিন্তু আমার দেশ দুশো বছর আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে—একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

তাই সেই মহিলাটিকে যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলুম। তার ওপর যখন আমার গায়ে হাত দিলেন তখন আমি তাঁকে কি জবাব দেবো ভেবেই পেলুম না। পল্লীগ্রামে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে দেখলে হয়ত তাঁকে ননদের কাছে রীতিমত গঞ্জনা ভোগ করতে হতো। কেননা আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করলে সেই মহিলাটিকে অর্থাৎ দিদিকে স্বচ্ছন্দে যুবতী বলা যায়। বরঞ্চ পড়ো যুবতী মেয়েদের চেয়ে দিদির দেহে নারীত্বের আবেদন বেশী ছিল। অবশ্য এই দুই শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে কোথায় কতটা প্রভেদ তা আমি উদাহরণ দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারবো না। কেননা মেয়েদের রূপবর্ণনা করা কবিদের কাজ, আমার নয়। তবে এই সব কলেজে-পড়া আইবুড়ো মেয়েদের দেখলে আমার মনে হয় তারা যেন শীতের নদী—দেহের উভয় কূলে রূপের দাগ আছে মাত্র কিন্তু স্রোত চলে গেছে বহুদূরে। অথচ তিরিশের কাছাকাছি বয়স হলেও দিদির চেহারা ছিল একেবারে ভাদ্রের ভরা নদীর মত, নারীত্বের সে যেন পরিপূর্ণ রূপ! মাতা, ভগ্নি ও প্রিয়ার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! সিঁথিতে সিঁদূরের রেখা অমলিন, দুহাতে সাদা শাঁখা ও গাছ কয়েক সোনার চুড়ি, লালপেড়ে গরদের শাড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, কণ্ঠে ঈষৎ সঙ্কোচ—মাথায় কাপড় দেওয়া অথচ তা শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করেনি।

গাড়ী এসে ষ্টেশনে দাঁড়ালো। কিন্তু স্থান কোথায়—ভীড়ে ভীড়!

তার ওপর একটা দরজা দিয়ে একসঙ্গে সবাই ওঠবার চেষ্টা করছে। আমি ভীড় ঠেলে একটা দরজা হাত দিয়ে আগলে দাঁড়ালুম। তারপর দিদিদের আগে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়ে দিয়ে নিজে উঠলুম।

দিদি বললেন, ভাগ্যিস তুমি ছিলে ভাই, তাই ত উঠতে পারলুম! তোমার দাদাবাবুর ভরসায় থাকলে আজ সারারাত এই ষ্টেশনেই পড়ে থাকতে হতো।

দিদি আমার ওপর এতটা বেশী কৃতিত্ব আরোপ করাতে আমি বড় লজ্জাবোধ করছিলুম। তাই দাদাবাবুকে লক্ষ্য করে সর্ব্বপ্রথম আমি কথা বললুম, শুনলেন ত, দিদি আপনাকে সকলের সামনে একেবারে অকেজো প্রমাণ করে দিলেন।

তিনি মুখের একটা কুৎসিত ভঙ্গী করে বললেন, থাক হয়েছে, তোমাকে আর দাঁত বার করতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে দিদির ননদ বলে উঠলেন, মানুষ কি কুকুর বেড়াল নাকি যে একসঙ্গে কতকগুলোকে ঠেসে বোঝাই করে দিলেই হলো? এমন করে ঠায় দাঁড়িয়ে ত আর মানুষ সারারাত্তির যেতে পারে না। একে আমার ভাই চিরকালই একটু সুখী মানুষ, কখন ভীড় সহ্য করতে পারে না, তার ওপর বিদেশবিভুঁই জায়গা—যদি সর্দ্দিগরমী হয়ে পড়ে তাহ'লে কি হবে?

এই কথা বলতে বলতেই তিনি 'উ-হু-হু-হু গেলুম গেলুম' বলে চীৎকার করে উঠলেন।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, কি হ'লো বড়দি?

কি আর হবে! আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমার জন্যেই ত এই হ'লো। ওই মড়া আমার পা-টা মাড়িয়ে দিলে।

তারপর 'ওরে বাপরে গেলুম রে' 'আমায় কোথায় নিয়ে এলিরে' এই বলে তিনি এমন সুর করে কাঁদতে লাগলেন যেন সমস্ত অপরাধটা আমার।

আমার পাশেই ছিলেন দিদি। তিনি ননদকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, চুপ করো বড়দি, এত ভীড়ে ও বেচারা দেখতে পায়নি, তাই তোমার পা মাড়িয়ে দিয়েছে।

তা ত তুমি বলবেই। ওই ছোঁড়া যদি জোর করে আমাদের এই গাড়ীতে এমন করে বোঝাই না করতো তাহলে কি কিছু হ'তো?

এই বলে তিনি আরো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ওর কি দোষ? দিদি একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমার দিকে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ননদ বলে উঠলেন, না সব দোষ আমার—কৈ আমার ভায়ের সঙ্গে এত জায়গা ঘুরলুম, কোথাও আমার গায়ে একটু আঁচও ত লাগতে দেয় নি।

দিদি অস্ফুটস্বরে বললেন, এত লোকের সামনে তুমি এমন করে কেঁদো না, কি মনে করছে সকলে?

ওঃ! মনে করলে ত বয়ে গেল—নিজের হ'লে বুঝতে পারতিস ছোট বৌ—পরের দুঃখু কেমন করে বুঝবি?

আমি তখন যে হিন্দুস্থানীটা তাঁর পা মাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে বললুম, এই উল্লুক, আঁখসে দেখতা নহি?

হাত জোড় করে যেন কত অপরাধ করে ফেলেছে এইভাবে সে বললে, কসুর মাফ কি জিয়ে মহারাজ! বেহুঁসিয়ারীসে লাগ গিয়া। তারপর হিন্দীতে সে যা বললে তার মানে হচ্ছে এই যে, পা সে মাড়ায়নি শুধু একবার গায়ে পা-টা লেগে গিয়েছে মাত্র।

আমি নীচু হ'য়ে দেখলুম সত্যি তার পায়ে জুতো পর্য্যন্ত নেই, একেবারে খালি।

তখন আমার মুখের অবস্থা দেখে চুপি চুপি দিদি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, ওই রকম আমার ননদ—একটুতেই একেবারে গলে পড়েন। লেগেছে কিনা তারও বোধহয় ঠিক নেই।

ব্যাপারটা বুঝলুম। তবুও সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ছাড়লুম না। সেই হিন্দুস্থানীদের একটা দল ছিল, তারা কেউ শুয়ে, কেউ হেলান দিয়ে, দিব্যি আরামে বসে যাচ্ছিল। আমি তখন তাদের ধমক ধামক দিয়ে সরিয়ে বেঞ্চিতে একটু জায়গা করে বড়দি ও তার ভাইকে বসবার বন্দোবস্ত করে দিলুম। তারপর মালপত্তর-গুলোকে দরজার পাশে বেশ করে সাজিয়ে একটা জায়গা করে সেখানে দিদিকে বসতে বললুম।

দিদি কিন্তু একলা বসতে কিছুতেই রাজী হলেন না, আমার হাত ধরে বললেন, তুমিও বোস, আমিও বসি।

আমি হেসে বললুম, ওখানে যে একলা আপনার শ্রীদেহটীকেই ধরবে না।

দিদি বললেন, আরে ভাই যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায় ন' জন।

ইতিমধ্যে বড়দি ভাল ক'রে বেঞ্চিতে বসে ঠেলে ঠুলে বেশ স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর পায়ের ব্যথা বোধকরি বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেরে গিয়েছিল তাই দ্বিতীয়বার আর সেকথা উত্থাপন না করে আঁচলের গেরো খুলে পান ও দোক্তা মুখে দিতে দিতে বললেন, ও থাক্ না একটু দাঁড়িয়ে ছোট বৌ—জোয়ান ছেলে, ও পারে—তুমি ততক্ষণ বোসনা একটু, পরে খালি হলে ও বসবে'খন।

দাদাবাবু বললেন, হ্যাঁ, এত কষ্ট করে ও জায়গা করে দিলে সে কি

আর নিজের জন্যে, একথাটা বোঝনা? হেঁ-হেঁ-হেঁ—হেঁ-হেঁ—কি বলো ভায়া?

তাঁর এই অদ্ভুত হাসি যেন দিদিকে চাবুক মারতে লাগল।

দিদির মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম তাই তার উত্তরে বললুম, দিদির বুদ্ধিটা ঠিক আপনার মত সাফ নয় কিনা?

হেঁ-হেঁ—হেঁ-হেঁ-হেঁ—ঠিক বলেছো ভায়া, এতদিনেও মানুষ করতে পারলুম না—কি জানো, কথায় বলে না, মেয়েমানুষ দশহাত কাপড়ে—

চুপ! বলে একটা ধমক দিয়ে দিদি তাঁকে সেইখানে থামিয়ে দিলেন।

তিনি থামলেন বটে কিন্তু চুপ করলেন না—মেয়েমানুষের যে তিনি বাধ্য নন একথা দেখাবার জন্যেই বোধহয়। তবে সে প্রসঙ্গ আর উত্থাপন না করে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে বললেন, দেখি ভায়া একটা বিঁড়ি।

তাঁর শুকনো তোবড়ানো মুখে নীচ লোলুপতার এমন একটা ছবি ফুটে উঠলো যে তাই দেখে ঘৃণায় আমার মনটা রি-রি করে উঠলো। দিদির সঙ্গে এমন একটা লোকের বিয়ে কি ক'রে যে সম্ভব হলো এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখ ফেরাতেই দেখি দিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

আমি তাঁর বিস্ফারিত চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললুম, আমি ত বিঁড়ি খাইনা!

মুহূর্ত্তে দিদির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কণ্ঠে শত অপমানের গ্লানি ঢেলে দিয়ে স্বামীকে বললেন, ছি ছি লজ্জা করলো না তোমার ওইটুকু ছেলের কাছ থেকে বিঁড়ি চাইতে? ভদ্দর লোকের বড়াই করো আবার তুমি মুখে!

কেন ? ভদ্দর লোকেরা বুঝি বিড়ি খায়না ? দেখলে ভায়া একবার মেয়েমানুষের কথা !

এই বলে তিনি আমাকেই শালিসী মানলেন।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দিদির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। তিনি খপ্ করে বলে ফেললেন, ভদ্দর লোকেরা বিড়ি খায় কিন্তু হাঁটুর বয়সি ছেলের কাছে চেয়ে খায়না।

ও, এই—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—শোন ভায়া একবার কথাটা, বলি সংস্কৃতের সে শ্লোকটা একবার শুনিয়ে দাও ত তোমার দিদিকে ! কি বলে ? প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেত। মুনি ঋষিরা যে কথা বলে গেছেন তাকে কি অমান্য করা উচিত !

দিদি বললেন, মুনি ঋষিরা শুধু এই শ্লোকটিই লিখে যাননি, একথা ভুলে যেয়ো না।

দিদির কথায় কর্ণপাত না করে নিজের পকেট থেকে একটা বিঁড়ি বার ক'রে পাশের হিন্দুস্থানীদের কলকের আগুন থেকে সেটা ধরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, তোমার বয়স কত ভায়া ?

আমি বললুম, এই চব্বিশ।

ব্যস্—তবে ত মাইনরিটি পেরিয়ে গেছ—আমার ত কোন দোষই হয়নি।

আমি তাঁর কথার উত্তর দেবার আগেই দিদি বললেন, কিন্তু তোমার বয়সটা কত শুনি ?

বারকয়েক কেশে এবং বারকয়েক বিঁড়িতে ঘন ঘন টান দিয়ে তিনি বললেন, এই লাষ্ট ডিসেম্বরে উনচল্লিশে পড়েছি—তবে তোমার আর আমার বয়স যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু এখনো আমি

বত্রিশ পেরোইনি ! আচ্ছা ভায়া তুমিই বল দেখি, তোমার দিদি যে আমার second fortnight অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ, আমাকে দেখে কি তা বোঝা যায় ?

আমি একথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একবার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলুম !

গাড়ী এসে কী একটা ষ্টেশনে থামল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক নেমে গেল।

দিদির ননদ কোন কথা না বলে আগে হাত পা ছড়িয়ে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লেন এবং যেন কতকটা কৈফিয়ৎ দেবার মত করেই বললেন, বেতো রুগী এতক্ষণ হাত-পা মুড়ে বসে থেকে সর্ব্বাঙ্গ খসে পড়ছে। তারপর নিজের ভাইটিকে ডাক দিয়ে বললেন, ও নেড়া, এই বেলা তোর বিছানা একটু খেলিয়ে নিলিনা কেন—কাঠের ওপর বসে থাকলে যে গায়ে ব্যথা হবে।

সে আর তোমায় বলতে হবে না দিদি—লোক নামবার আগেই আমি একটু একটু করে সরিয়ে দিয়েছিলুম বিছানা ! তা নাহলে এই মেড়ো ব্যাটাদের সঙ্গে পারা যায় ! এই বলে নেড়া অর্থাৎ দাদাবাবু চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কি মনে করে তিনি বললেন, ভায়া খুব হুঁসিয়ার থেকো, পরের ষ্টেশনে যেই কেউ নামবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুমি বসে পড়ো।

আমি কোন কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে তাঁর এই মহদুভিপ্রায়ে সম্মতি জানালুম। রাগে ও অপমানে যেন দিদির অন্তর পুড়ে যেতে লাগল।

তিনি মুখে তা প্রকাশ না করলেও তাঁর মুখ চোখ দিয়ে একটা ঝাঁজ বেরুতে লাগল, আমি লক্ষ্য করলুম। স্বামী ও ননদের এই স্বার্থপরতা দেখে তিনি যেন অপমানে মরে যেতে লাগলেন আমার কাছে। একটু পরে বললেন, তুমি বোস না ভাই এখানে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

বললুম, কিছু ব্যস্ত হবেন না। আমি বেশ আছি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ব্যথা হয়ে গেল !

এত সহজে আমার পা ব্যথা হয় না দিদি।

কেন, তোমার পা কি লোহার ?

ছেলেবেলায় পড়া না পারলে মাষ্টারমশায় বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতেন, সেই থেকে ওদিকটা অভ্যাস হয়ে গেছে, ভয় নেই।

দিদি একটু মুচকি হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে কথায় পারা দায় ! তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করো—আমায় কিন্তু মনে মনে গালাগালি দিয়ো না যেন।

অস্ফুটস্বরে বললুম, বরঞ্চ ধন্যবাদ দেবো, তবুও আপনার জন্যে খানিকটা কষ্ট ভোগ করবার সৌভাগ্য হলো এই ভেবে।

ভারী দুষ্টু ! বলে তিনি আমার হাতে একটা ছোট্ট চিমটী কাটলেন।

গাড়ী চলেছে উন্মত্তবেগে। ষাট, সত্তর মাইল অন্তর শুধু বড় বড় এক একটা ষ্টেশনে এসে থামছে। কিন্তু লোক আর কেউ নামে না। সকলের গন্তব্যস্থান বোধহয় আমাদের মত একই জায়গায়। ভীড়ের মাঝে আমি দাঁড়িয়ে আছি কোন রকমে দিদিকে আড়াল করে। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। বাইরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী

একটানা শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে। ভিতরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ! সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন ! বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, হেলান দিয়ে যে যেখানে যে অবস্থায় আছে সকলের চোখেই যেন ঘুমের ঘোর লেগেছে। মনে হয় মায়াবিনী নিদ্রাদেবী যেন অমোঘ বলে সবাইকে টানছে, আর তার মোহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সকলে প্রাণপণ লড়াই করছে। কেউ বা নিরুপায় হয়ে তার কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করছে, কেউ বা সচকিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, সেই বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যটি উপভোগ্য করছিলুম। নিদ্রাদেবীর তখন আমি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ঘুমের যুদ্ধে অন্য সকলের হারবার সম্ভাবনা থাকলেও আমি যে একেবারে অজেয় একথা তিনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন রাত দেড়টা কি দু'টো হবে। দিদিরও ঘুম বেশ ধরেছিল। ওই অবস্থায় তিনি দরজার ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে চমকে উঠে বাঁ হাতে করে মাথার কাপড়টা টেনে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার ঘুমটা চোখ থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন, তারপর আমার হাতটা ধরে টানলেন, বোস বলছি, শেষে কি অসুখ-বিসুখ ধরাবে একটা।

এই বলে তাঁর সদ্যঘুমভাঙ্গা চোখ-দুটি তুলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি এবার আর না বলতে পারলুম না। তাঁর-ই পাশে বসে পড়লুম। পা-দু'টো তখন সমস্ত শরীরের চেয়ে যেন দশ গুণ ভারী বলে মনে হচ্ছিল। গোটাদুই হাই তুলে পিঠটা পিছনের মালপত্রের ওপর একটু এলিয়ে দিতেই দিদি বললেন, তুমি এত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছো

কেন, বেশ ভাল করে বসো—এই বলে তিনি নিজে আরো একটু কাত হয়ে যতটা সম্ভব জায়গা আমায় করে দিলেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনা। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখি দিদির মাথাটা আমার কাঁধের ওপর। তাঁর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালে লাগছে, আর হাওয়ায় তাঁর দু'একটি চূর্ণ কুন্তল আমার কপালের ওপর এসে উড়ে উড়ে পড়ছে।

একবার আড়চোখে গাড়ীর ভিতরটায় চোখ বুলিয়ে নিলুম। দেখলুম সবাই ঘুমছে। তখন আস্তে আস্তে দিদির মাথায় হাত দিয়ে ডাকলুম, দিদি, দিদি, উঠুন!

আমার হাতটা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, কি? উঠবো কেন—ওঃ, তোমার কাঁধে লাগছে বুঝি? দিব্যি বালিসটা পেয়েছিলুম, না?

এই বলে ঈষৎ হেসে মাথায় কাপড়টা টেনে দিতে দিতে তিনি উঠে বসলেন।

আমি এর উত্তরে একটা জুৎসই জবাব দেবো ভাবছি এমন সময় বেঞ্চির দিকে চোখ পড়তেই দেখি দাদাবাবু আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। দিদি কোন কথা বলবার আগেই তিনি বলে উঠলেন, তুমি আমার এখানে শোবে এসো—আমি ওখানে গিয়ে বসছি।

দিদি কোন প্রতিবাদ না করে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং দাদাবাবু এসে আমার পাশে বসে একটা বিঁড়ি ধরালেন।

আমার চোখে আর ঘুম এলোনা। রাতও তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তার ওপর বিঁড়ির গন্ধে আমার গা ঘিন ঘিন করছিল।

বাকী পথটা দাদাবাবু আমার সঙ্গে একটাও কথা বললেন না।

শুধু নিঃশব্দে একটির পর একটি বিড়ি ধ্বংশ করতে লাগলেন। তাঁর মনে তখন কি চিন্তা উদয় হচ্ছিল তা তিনিই জানেন!

সকাল ছটার সময় আমাদের গাড়ী গিয়ে থামল হরিদ্বার ষ্টেশনে। দিদি তাঁর ননদ ও দাদাবাবু মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনে নামলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নেমে দাঁড়ালুম। ছ'টি কুলি এসে দাদাবাবুকে বললে, বাবুজী কুলি?

দাদাবাবু বললেন, হাঁ হাঁ।

তারা ছ'জনে যখন মাল-পত্তর গুছিয়ে নিতে লাগল, দিদির ননদ তখন বললেন, এই, এক আদমী, একজন কুলিতেই হবে— আমরা এতগুলো লোক রয়েছি একটা একটা হাতে করে নিলেই হবে— মিছিমিছি কুলিকে 'গুচ্ছের' পয়সা দিয়ে কি লাভ?

দিদি বললেন, কিন্তু বরাবরই ত আমাদের ছ'জন করে কুলি হয়েছে!

হয়েছে বলে এখনো করতে হবে নাকি? পয়সা কি তোমার কামড়াচ্ছে? এই বলে তিনি দিদিকে একটা ধমক দিলেন।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে চুপ করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে দাদাবাবু বললেন, এই ত গেট দিয়ে বেরুলেই গাড়ী, কি বলো ভায়া— মেয়েমানুষ এমন অবুঝ—পয়সা ত আর খেটে রোজগার করতে হয় না নিজেদের?

আমি দিদির দিকে চেয়ে বললুম, ভাবছেন কেন? আমি ত রয়েছি, এইটুকু পথ হাতে হাতে সব পার করে দেবো।

দিদি কোন কথা না বলে শুধু নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে একবার চাইলেন। সেই চাওয়ার অর্থ হলো এই যে, এরা স্বার্থপর, এরা তোমাকে

দিয়েই বোঝা বইয়ে নেবে এই কটা পয়সা বাঁচাবার জন্যে, তুমি তা করো না।

আমি একটু হেসে দাদাবাবুকে বললুম, বিদেশে এলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেই হয়, কি বলুন?

নিঃশেষিত-প্রায় একটা বিঁড়িতে শেষ টান দিয়ে দাদাবাবু হেসে উঠলেন, বিকট, কুৎসিত ভঙ্গীতে। তারপর কুলি যে মালগুলো নিতে পারলে না তার সবগুলো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে দিতে বললেন, বুঝলে ভায়া, মেয়েরা ওসব কিছুই বোঝেনা, fel'ow feeling ব'লে জিনিষটা একেবারেই এদের ভেতর নেই।

আমি শুধু একবার দিদির মুখের দিকে তাকালুম। অপমানের গ্লানিতে তাঁর মুখটা তখন কালি হয়ে গিয়েছে।

আমি নীরবে আমার বিছানা ও সুটকেশের সঙ্গে মালপত্তর নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। দাদাবাবু একটা টাঙ্গা ডেকে এনে তাতে সমস্ত জিনিষ সাজিয়ে নিলেন। তারপর আমার ছোট্ট সুটকেশ ও বিছানাটা আমার হাতে দিয়ে দিদি ও তাঁর ননদকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিল। জিনিসপত্রে গাড়ী ঠেসে গিয়েছিল—তিল ধারণের আর স্থান ছিল না, তারি মধ্যে কোন রকমে বসে একটা বিঁড়ি ধরাতে ধরাতে দাদাবাবু বললেন, দেখা ক'রো ভায়া, আমাদের পর ভেবোনা যেন।

তার উত্তরে আমি শুধু দু'হাত তুলে নমস্কার করলুম। আমার মুখে আর কোন কথা জোগাল না। ধূলো ওড়াতে ওড়াতে তাদের গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে।

নবম পরিচ্ছেদ

ছোট স্যুটকেশটি হাতে ঝুলিয়ে এবং বিছানাটি বগলে নিয়ে আমি একাই তখন একটা আশ্রয়ের সন্ধানে চললুম। কিন্তু কোন্ দিকে যাবো? যেদিকে চাই দেখি ভীড়ে ভীড়! জনস্রোত! শুধু অসংখ্য নরমুণ্ড সেই পাহাড়-ঘেরা স্বল্প স্থানটির মধ্যে ঘুরে মরছে।

ভীড় ঠেলতে ঠেলতে একটা রাস্তা দিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে এসে পড়লুম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রীরা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, নীলধারাকী জয়! গঙ্গা মায়িকী জয়!

তাদের সেই ভক্তিবিজড়িত কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি শুনে আমি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম। তারপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল জীবনে তা ভুলব না।

চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। স্বচ্ছসলিলা, কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গা, দুকূল প্লাবিত করে ছুটে চলেছে যৌবনের প্রাণবন্যায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। তার এমন রূপ আর কখনো দেখিনি। তাই বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলুম সেদিকে।

ওপারে শ্যামল বনরেখা, তার পিছনে উত্তুঙ্গ পাহাড় তরঙ্গায়িত—তারি মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে অসংখ্য মানুষের কোলাহল! এপারে, ওপারে, সামনে, পিছনে, পথে ঘাটে, বাড়ীতে, সর্ব্বত্র শুধু মানুষ! এত মানুষ আমি একসঙ্গে আর কখনো দেখিনি। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন একত্রিত হ'য়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো—সমস্ত দেশের লোককে নিয়ে। পাঞ্জাবী, মারাঠি, গুজরাটী, মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, উড়িয়া প্রভৃতি নরনারীর অভূতপূর্ব্ব সমন্বয়। এমন সার্ব্বজনীন

সুদূরের পিয়াসী

জনসমাগম ভারতের আর কোন পর্ব্বকে উপলক্ষ করে বোধহয় হয় না। তার ওপর জটাজুটবিলম্বিত, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীরও শেষ নেই। কিম্বদন্তী, যত কঠোর তপস্বী, দুর্গমগিরিগুহাবাসী হোক না কেন, প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসীই নাকি এই কুম্ভযোগে গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। সেইজন্য ওই দিনটিতে পবিত্র গঙ্গার জল আরো পবিত্র হ'য়ে ওঠে। আর তাইতে অবগাহন করে সংসারী মানুষও পাপ-তাপ ক্ষালন করে।

যাই হোক—এই ভীড়ের মধ্যে আমি কোথায় আশ্রয় পাবো তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলুম। শুনেছিলুম ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থের মধ্যে এইখানেই সব চেয়ে বেশী ধর্ম্মশালা আছে। বোধহয় সাড়ে তিনশোরও বেশী। আর কিছুক্ষণ পরে তার চাক্ষুস প্রমাণও পেলুম। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অসংখ্য ঘর দালান ও উঠোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কোনটি গঙ্গার গর্ভে, কোনটি বা রাস্তার ওপরে। সুন্দর ধর্ম্ম-শালাগুলিকে দেখতে। উঁচু উঁচু ফটক, পাথরের কারুকার্য্যখচিত, কোনটি তিন মহল, কোনটি বা চার মহল।

আমি একটার পর একটাতে অনুসন্ধান করতে লাগলুম কিন্তু কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। সব জায়গায় যাত্রী। অতিরিক্ত যাত্রী, ঘরের মধ্যে থাকা ত দূরের কথা—দালানে, রকে, বারান্দায়, উঠোনে যে যেখানে পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে।

সাতচল্লিশটি ধর্ম্মশালা আমি ঘুরলুম, কোথাও স্থান নেই। সাতটা থেকে বেলা বারোটা বাজল। ক্ষিদেয় ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙ্গে পড়ছে কিন্তু জায়গা কৈ, কোথায় উঠবো? ছোট ছোট তাঁবু ও উলুখড়ের চালাঘর অসংখ্য, মাঠে রাস্তার ধারে ও বাগানের মধ্যে নজর পড়লো। কিন্তু তাদের একটাও খালি নেই—সব ভাড়া হ'য়ে গেছে। কি করি

ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় দেখি একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সরকারী প্রসাবখানার দেওয়ালের ধারে বসে আছেন বিরক্ত মুখে। বল্লুম, দাদা, এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাবো বলতে পারেন ?

তিনি যেন একেবারে আমায় মারতে উঠলেন। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, বলতে পারলে আমি এই নরকের কাছে সারা রাত্তির বসে থাকি ? সকাল থেকে আমার লোকও ঘুরছে জায়গার জন্যে কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত পায় নি।

এইবার তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, তখুনি বললুম, যখন আগে থাকতে কোন ব্যবস্থা করা নেই, যাওয়া উচিত নয় হয়ত জায়গা পাবো না। যেমন কথা শুনলে না, এখন হয়েছে ত ? মেয়েমানুষের বুদ্ধি শুনে যখনই কোন কাজ করি তখনই এই অবস্থা ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি বিনীতভাবে বললুম, তাঁবুটাবুগুলো কি ভাল করে দেখেছেন !

তুমি ছোকরা আর বেশী বোকো না ! আমি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটী, এ বুদ্ধিটুকু তোমার কাছ থেকে না নিলেও চলবে।

এই বলে তিনি আমাকে এমন ভৎসনা করলেন যে আমি আর কোন কথা বা প্রশ্ন না করে আবার রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলুম।

পেছন ফিরতেই শুনলুম সেই ভদ্রলোকটি আবার বলছেন, একটা চারজনের তাঁবুর জন্যে একশো টাকা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিলুম কিন্তু সব রিসার্ভড্। রাম, রাম, মেয়েমানুষের কথা মানুষে শোনে !

সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাঙ্গা ও মোটা নারীকণ্ঠের ঝঙ্কার কানে এলো, ওঃ মেয়ে মানুষের ওপর বড় যে ঘেন্না দেখছি। বলি, এই মেয়েমানুষ ছিল

বলেই এ যাত্রা তরে গেলে, মনে থাকে যেন! পড়তে ওই টেঁপীর মার মত মেয়ের পাল্লায় ত বুঝতে পারতে!

১৯৩৮ সালের এপ্রেল মাস। আমাদের বাংলাদেশে তখন অসহ্য গরম কিন্তু ওখানে দারুণ শীত। তারি মধ্যে লোকগুলিকে যেখানে সেখানে ওই অবস্থায় দেখে মনে হ'লো, হায়রে, আমরা এখনো কোথায়! আমরা গর্ব্ব করি আমাদের দেশ এগিয়েছে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিক্ষায় সভ্যতায়, কিন্তু কৈ একশো বছর আগেও যেমন ছিল, এখনো দেখছি ঠিক তাই। পুণ্যার্জ্জনের লোভে মানুষের এ কী অবস্থা! শীতগ্রীষ্ম নেই, স্থান অস্থান নেই, নরনারীর পার্থক্য নেই, মান সম্ভ্রমের কথা পর্য্যন্ত যেন লোক ভুলে গিয়েছে। সেই পুণ্যতিথিটির জন্যে যেন সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। অথচ তখন স্নানের তিনদিন বাকী! কি হবে? কোথায় স্থান পাবো? একবার মনে হ'লো দূর হোক্‌গে না হয় ফিরে যাই দেশে। বৃন্দাবনে আমার আংটীটা বিক্রী করেছিলুম। তার দরুণ তখনো আমার কাছে ফিরে যাবার মত টাকা ছিল।

কিন্তু তখন আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে, বিশ্রাম চাই। গঙ্গার একটা ঘাটে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু জলযোগ ক'রে আবার আশ্রয়ের খোঁজে বেরলুম।

এবার বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে পূব মুখে চললুম কঙ্খলের দিকে। লাল রঙের পুলটা পেরিয়ে ওপারে গেলুম। ভীড় এখানেও যথেষ্ট, তবে 'হরকি পিয়ারী' ঘাটের থেকে অনেক কম। রাস্তার দু'ধারে দেখলুম বাগান-ই বেশী। তারি মধ্যে কোথাও তাঁবু পড়েছে সারি সারি, কোথাও বা উলুখড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে। পিচের

রাস্তার ধারে ধারে নানা রকমের অস্থায়ী দোকান, কোনটা টিন দিয়ে ঘেরা, কোনটা বা দরমা ও হোগলার! তবে অধিকাংশই খাবারের দোকান, কোনটায় দুধ দৈ বিক্রী হচ্ছে, কোনটায় বা পুরী কচুরী, আবার কোনটা ভাত তরকারীর হোটেল—কোথাও বা শুধু গরম ফুলকা অর্থাৎ আটার রুটী বিক্রী হচ্ছে। এছাড়া আমাদের দেশের রাস হাটার মত হরেক রকম মনিহারী দোকান, তাতে সস্তার জাপানী মালই বেশী।

যেতে ডানহাতি আমবাগানের মধ্যে সাদা পাথরের নুড়ি স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য, এগুলি সব গঙ্গার ভেতর থেকে উঠেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রভৃতি স্থানে একেবারে লোক ভর্ত্তি। বহু বাঙ্গালী লোকজনের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হ'লো। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করি আশ্রয়ের কথা সেই বলে, মশায় ও কথাটা আর মুখে আনবেন না। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক ফিরে যাচ্ছে এখান থেকে। শেষে কন্খলের আরো দু'তিনটে ধর্ম্মশালায় জায়গা না পেয়ে বিফল মনে আবার হরকি পিয়ারীর দিকে ফিরলুম।

কন্খলের দিকে মিশন ও সঙ্ঘের ছড়াছড়ি। সাধু সন্ন্যাসীর ভীড়ও এই দিকটায় বেশী, আমাদের মত ঘোরতর সংসারী লোকেদের স্থান সেদিকে নেই বললেই হয়। এক একটা সম্প্রদায়ের নাম, লাল শালুতে লেখা এক একটা বাগানের ফটকে ঝুলছে। এত রকমের সঙ্ঘ ও এত রকমের সম্প্রদায় যে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে আছে তা এই প্রথম চাক্ষুষ দেখা গেল। বিশেষ করে যাঁরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁদের মধ্যেও এত দলাদলি, ভেদাভেদ আছে দেখে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। যাঁরা সমস্ত ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ হিন্দুদের একতাবদ্ধ ক'রে একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবার

কল্পনা করছেন—ইচ্ছা হ'লো তাঁদের একবার এনে দেখাই আমরা কোথায়। ধর্ম্মের নামে, পুণ্যের লোভে আমরা তীর্থস্থানে এসেও একত্র হতে পারিনা—এই আমাদের জাতির বিশেষত্ব। যাঁরা সংসারের নাম মুখে উচ্চারণ করাকে পাপ মনে করেন, যাঁদের দেহে পর্য্যন্ত কোথাও আসক্তির চিহ্ন নেই—কেউ বা কৌপীনধারী, কেউ বা নাগা, একেবারে উলঙ্গ, তাঁদের মধ্যেও যদি এই রকম ভেদনীতি থাকে তাহ'লে গৃহী লোকের কাছ থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি? মনে পড়লো একদিন রিক্সায় চেপে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। সন্ধ্যা তখন হয়নি, ভরা অপরাহ্ন যাকে বলে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে রিক্সাওয়ালাটা থেমে গেল। বল্লুম, কি হ'লো রে! সে বললে, আতা হ্যায় বাবু। এই বলতে বলতে ফুটপাতের উপর বসে যে জুতোওয়ালাটা সামান্য কয়েককুচি ফল খাচ্ছিল তার কাছে গিয়ে তার পাত থেকে গোটাকতক ফলের টুকরো মুখে দিয়ে আবার এসে রিক্সাটা হাতে তুলে নিলে। মনে পড়লো তখন যে ওদের রোজা চলেছে। তাই প্রশ্ন করলুম রিক্সাওলাকে, ও তোমার কে হয়?

রিক্সাওলা বললে, কোউন্?

—ওই যে যার কাছ থেকে ফল খেলে? ও বুঝি তোমার আপনার লোক?

রিক্সাওলা অত্যন্ত সহজ ও সরল কণ্ঠে উত্তর দিলে, ও হামার মুসলমান ভাই হায়।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার পিঠে সজোরে চাবুক মারলে। এই অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালাটার যে জাত্যভিমান আছে আমাদের সেটুকু পর্য্যন্ত

নেই! সেইদিন বুঝলুম কেন আমরা নেমে যাচ্ছি, আর ওরা ওপরে উঠছে। সত্যি সত্যি সঙ্ঘশক্তি যাদের এতবড় তারা কেন আজও এত পেছিয়ে রয়েছে তাই ভাবতে লাগলুম। ওদের একজনের দুঃখে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বুকে ব্যথা বাজে, একজনের ওপর অত্যাচার হলে তাই সবাই ক্ষেপে ওঠে। ন্যায় নেই, অন্যায় নেই, বিচার পরে হবে! এখন তোমার ভাই বিপন্ন, আগে তাকে রক্ষা করো তারপর তার কৈফিয়ৎ। এই হলো ওদের নীতি। চমৎকার! ভুলে গেলে চলবে না যারা অন্যায়ের জন্যে লাঠি ধরে তারা ন্যায়ের জন্যেও ধরতে পারে, এবং হয়ত আরো দৃঢ় করে পারে। মনে হলো চীৎকার করে বলি, হে ভগবান তুমি আমায় মুসলমান করে দাও। 'মুসলমান ভাই হায়', সেই কথাটী তখনো আমার শিরায় উপশিরায় আর্ত্তনাদ করে মরতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়। ভ্রাতৃত্বের এতবড় উদাহরণ জগতে আর কোন জাতের মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না। ধন্য মুসলমান ধর্ম্ম! ধন্য মুসলমান জাতি! তোমরা দীর্ঘজীবি হও! নিশ্চয়ই পৃথিবী একদিন তোমাদের পায়ের তলায় এসে কাঁদবে। আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি।

এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, কি মুশয় কৈ চললেন? তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হ'লো যেন তিনি আমায় বিদ্রূপ করছেন। তাই কোন জবাব না দিয়ে আমি আরো জোরে পা চালিয়ে দিলুম। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, বিরক্তিতে তখন আমার শরীর ঝিমঝিম করছিল, তার ওপর আশ্রয়হীন হ'য়ে সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত ঘুরছি স্রোতের শ্যাওলার মত।

তিনি আবার বললেন, আরে বাই, আমার ওপর রাগ করস্

ক্যেন? অত্যন্ত সপ্রতিভ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মুখে চোখে তাঁর একটা পূর্ব্ববঙ্গীয় সরলধূর্ত্ততা। আমার কাঁধে এসে হাত দিয়ে তিনি সস্নেহে বললেন, জ্যায়গা নাই ত আমি কি করুম্—সকাল থ্যাইকা বোধহয় অরাই শো বাঙ্গালী বেবাকটী ফিরত গেল। এত দেরী কইরা আসছস্ কেন বাই—

আমি বললুম, দেরী? এখনো ত তিনদিন বাকী।

—হঃ, বলে সাতদিন আগে থ্যাইকা জ্যায়গা নাই।

বললুম, চুলোয় যাক্ জায়গা আমার দরকার নেই। আমি ত আর মেয়েদের মত পুণ্যি করতে আসিনি—আমি এসেছি ভীড় দেখতে। তা আমার সে কাজ হ'য়ে গেছে—বিকেলের গাড়ীতে মনে করছি সরে পড়বো এখান থেকে।

তিনি পান খাওয়া লাল দাঁতগুলি বের করে বললেন, ক্যান? চলে জাবা ক্যান্—বীর ছ্যেখবো কইছো—অহনি বীরের অইছে কি?

আমি বিস্মিত হ'য়ে বললুম, তার মানে! জ্যায়গা নেই ত থাকবো কোথায়!

আরে বাই, আমি যহন তোমায় ডাক্‌ছি তহন কি জ্যায়গার একটা ঠিক না কইরা ডাক্‌ছি ভাবছস্? বলে তিনি মুখে একটা অদ্ভুত হাসি টেনে আনলেন।

আমার যেন ধড়ে প্রাণ এলো! বললুম, সত্যি বলছেন জায়গা আছে?

তিনি বললেন, আরে না—না—জ্যাগ গা নাই তবে তোমার জন্যে একটা কইরা দিব, তুমি যহন আমারে ধরছো রে বাই, তহন কোন চিন্তা নাই।

এই বলে তিনি যা বললেন তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে আরো,

বহুলোক তাঁকে খোসামদ করেছেন জায়গার জন্য কিন্তু তিনি কাউকে দেননি তবে নাকি আমাকে কলকাতার লোক দেখে তিনি এই উপকার করছেন। তারপর আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, গোটা কুড়ি টাকা হলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সর্ব্বনাশ! এত টাকা কোথায় পাবো? আমার কাছে তখন মোটে পনেরো টাকা ছিল। পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করছি টাকাগুলো আছে কিনা এবং মনে মনে ভাবছি কি করবো, এমন সময় তিনি বললেন আরে থাক থাক এখন দিতে হবে না—পরে দিলেই হবে।

আঃ বাঁচলুম! একটা ত আশ্রয় এখন পাওয়া গেল তারপর টাকার কথা পরে ভাবা যাবে। এই মনে করে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলুম।

সেই ভদ্রলোক তখন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে ঢুকলেন 'গঙ্গা ভাগীরথী' ধর্ম্মশালার ফটকের মধ্যে। চমৎকার একটি বাগান, লকেট ফল থোলোয় থোলোয় ঝুলছে গাছে গাছে, ডানদিকে সারি সারি জলের ট্যাঙ্ক—ঘানি-গাছের মত একটা গরু অনবরত ঘুরছে আর বিরাট ইঁদারার মধ্যে থেকে লোহার যন্ত্রে জল উঠে সেই ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি হচ্ছে। সামনে একটা ফাঁকা মাঠ, তারি মধ্যে সারি সারি তাঁবু ফেলা। ছোট ছোট তাঁবু, মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। তারি একটায় নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এতে আমরা পাঁচজন আছি তবে আর একজনের জায়গা আছে। আর একজনের জায়গা কোথায় না দেখতে পেয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

তুমি ওইখানে বিছানা পাতো না, এই বলে তিনি কল্পিত একটা জায়গা আমায় দেখিয়ে দিলেন।

মাটীর ওপর খড় বিছিয়ে যে যার বিছানা পেতেছে—কিন্তু এত স্থানাভাব যে কোন রকমে হয়ত আমার মত একটা রোগা লোক সেখানে

ধরে। যাই হোক সুটকেশটা মাথার কাছে রেখে কোন প্রকারে বিছানাটা বিছিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক এসে বললেন, আমার নাম রোহিণী সেন। এখানকার সকলেই আমায় চেনে, আমি পনেরো দিন হ'লো এখানে এসেছি। চল তোমায় পাইখানাটা দেখিয়ে দিই।

এই বলে আমায় সঙ্গে করে সব দেখিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এইবারে আগে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে স্নানটা সেরে এসো, তারপর এখানে হোটেল আছে, তিন আনা খরচ করলেই সুন্দর খাওয়া। তবে নিরামিশ ভাই, মাছ ঢোকা এখানে একেবারে নিষিদ্ধ! আমি বাঙ্গাল মানুষ, মাছ না খেয়ে খেয়ে ক'দিনে আমাশয় ধরে গেছে। তবে একটু ঘি দুধ বেশী করে খেয়ো—তাহ'লেই চলবে।

বললুম, মাছ না হ'লেও আমার কোন অসুবিধা হবে না—নিরামিশ খেতে আমি ভালবাসি। তারপর বললুম আচ্ছা রোহিণীবাবু, স্নানটা আজ এইখানেই সেরে নেওয়া যাক্, ব্রহ্মকুণ্ডে কাল যাওয়া যাবে কি বলেন?

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, না না তাহয় না, প্রথম দিন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে হয়। যখন এসেছো এত পয়সা খরচ করে এতদূর তখন পুণ্যিটাই বা ছাড়বে কেন? দু'টা পয়সা দিলেই টাঙ্গা শেয়ারে 'হর কি পীয়ারী' ঘাট পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। এতক্ষণ গেছে, আর খেতে না হয় পনেরোটা মিনিট দেরী হবে। চলে যাও ভায়া। এই বলে তিনি একরকম জোর করেই আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

হাজার হোক হিন্দুর ছেলে, যতই মুখে বলিনা কেন শুধু জনসমাগম দেখতে এসেছি তবুও এই কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলুম না।

গামছাটা সুটকেশ থেকে বার করে নিয়ে শেয়ারের টাঙ্গায় চেপে ব্রহ্মকুণ্ডে চলে গেলুম।

মহাদেবের গান শুনে যখন বিষ্ণুর দেহ গ'লে জল হয়ে গিয়েছিল তখন ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে করে ভরে নিয়েছিলেন বিষ্ণুর সেই দ্রবীভূত দেহ। তারপর গঙ্গার রূপ ধারণ করে ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রথম তিনি ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে এইখানে অবতরণ করেন তাই এর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। এইখানে স্নান করলে মানুষের নাকি সমস্ত পাপক্ষালন হয়, পুনর্জন্ম হয় না।

যাই হোক ঘাটে তখন স্নানার্থীর ভীড় বিশেষ ছিল না। 'হর কি পিয়ারী' ঘাট থেকে সাদা পুলটা পেরিয়ে আমি ক্লক টাওয়ারের নীচে গিয়ে দাঁড়ালুম। আশে পাশে কয়েকজন নরনারী স্তবপাঠ করতে করতে স্নান করছিল। আমি সেইখান থেকে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। অদ্ভুত দৃশ্য! সামনে, পিছনে, ডাইনে বামে—যেদিকে চোখ ফেরাই শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় তার উত্তুঙ্গ চূড়া নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; মনে হ'লো যেন হিমালয় স্নেহময় পিতার মত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আপনার ক্রীড়ারতা আদরিণী কন্যা গঙ্গা দেবীর দিকে!

ব্রহ্মকুণ্ডর দিকে পিছন ফিরে গঙ্গার দিকে চাইতেই আমি বিদ্যুত স্পর্শের মত চমকে উঠলুম। একি! আমি কি বাস্তবলোকে আছি কিংবা স্বপ্ন দেখছি বুঝতে পারলুম না। বিংশশতাব্দীর দিনে এতগুলি নরনারীর চোখের সামনে, প্রকাশ্য দিবালোকে একি সম্ভব! চোখ দু'টোতে হাত দিয়ে একবার অনুভব করলুম, এখনো আছে কিনা। হাঁ আছে। তাহলে ত সত্যই আমি দেখছি আমার চোখের সামনে ওই দৃশ্য! দুটি রমণী—একজনের বয়স প্রায় চব্বিশের কাছাকাছি ঢিলে পায়জামার

ওপর পাঞ্জাবীপরা এবং মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে একটা পাতলা উড়ুনী ঢাকা। তার পোষাকটা অতি সাধারণ সাদা কাপড়ের, পায়ে একজোড়া সাধারণ চটি। কিন্তু আর একজনের মাথায় উড়ুনী নেই লম্বা বেণী ঝুলছে, তবে মূল্যবান মখমলের রঙীন পায়জামা ও পাঞ্জাবী গায়ে, আর পায়ে জরীর নাগরা। বছর পনেরো ষোল বয়স, অবিবাহিতা তরুণী। বোধ হয় দুই বোন হবে। চেহারা দেখে মনে হ'লো কাশ্মীরী।

তরুণী আমার দিকে ফিরে সকলের প্রথমে পা থেকে জুতো খুললে তারপর পাঞ্জাবীর বোতামটা আস্তে আস্তে আলগা করে মাথার ওপর দিয়ে জামাটা খুলে ফেললে এবং এরপর সমস্ত বিস্ময়কে বিস্মিত করে সহজ ও নির্ব্বিকার চিত্তে পায়জামাটাও খুলে ফেললে। তারপর সেই অবস্থায় সহজ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটা অতি সূক্ষ্ম আদ্দির চাদর গায়ের ওপর ঘেরাটোপের মত দিয়ে জলে নামল। আবার স্নান শেষ করে উঠে এসে ঠিক পূর্ব্বপ্রথায় আগে উড়ুনীটা ফেলে দিয়ে একটা একটা করে পোষাক পরলে।

কাশ্মীরীমেয়ে, বিশেষ করে পনেরো ষোল বছরের সেই যুবতীটীর নিরাবরণ দেহের বর্ণনা করবার মত ক্ষমতা আমার নেই এবং আর কোন শিল্পীর আছে কিনা সন্দেহ! আমি র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও দ্য ভিচিঁর খোদিত বহু নারীদেহের নিখুঁত ছবি দেখেছি—আবার টিসিয়ান ও রেমব্র্যাণ্টের তুলির অপরূপ বর্ণসুষমাও দেখেছি কিন্তু আমি জোরগলায় বলতে পারি এই দু'য়ের যদি অভাবনীয় সম্মিলন কখনো সম্ভব হয় তবুও সে মূর্ত্তির তুলনা মিলবে না। আমার মনে হলো যেন সেই স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে থেকে উঠে এলো এক জলপরী। তার সর্ব্বাঙ্গে নব অরুণোদয়ের দীপ্তি, চক্ষে কাশ্মীরী হ্রদের সুনীল কান্তি, বক্ষে অসংখ্য গোলাপ পুষ্প-

মণ্ডিত পর্ব্বতচূড়ার সুকঠিন কোমলতা—সে যেন সমস্ত কাশ্মীরকে ভরে এনেছে তার দেহের অনুতে পরমাণুতে। তার রূপে নেশা লাগে, মাথা ঝিম ঝিম করে, পুরুষ আত্মবিহ্বল হয়!

আমি কতক্ষণ তার দিকে চেয়েছিলুম জানি না। তবে সে চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ সেখানে বসেছিলুম। স্নানের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম এবং খাবারও আর প্রবৃত্তি ছিল না। তাই এক সময় যেমন কাপড় গামছা বগলে করে এসেছিলুম তেমনি ভাবেই আবার তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ক্ষিদেয় সর্ব্বশরীর ঝিম ঝিম করছে। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় রোহিণীবাবু এসে বললেন, কি ভায়া কি রকম পুণ্যিটা করলে?

বললুম, কল্পনাতীত। এ সৌভাগ্য জীবনে আর কখনো হবে কিনা সন্দেহ। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।

তিনি হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, দেখলে ভায়া, তুমি ত আগে যেতেই চাইছিলে না। বৃদ্ধস্যবচনং গ্রাহ্য—সেকেলে লোকের কথা শুনলে ভাল বই মন্দ হয় না। এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

পরের দিন আবার ঠিক সেই সময়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গেলুম। কিন্তু ঘাটে এত পেশাপিশি ভীড় যে কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এলুম। ব্রহ্মকুণ্ডে আর স্নান করা হ'লো না। শুনলুম সেখানে নাকি এক এক দিন এক এক লক্ষ করে যাত্রী এসে হাজির হচ্ছে। সকালথেকে রাত্রি পর্য্যন্ত পঞ্চাশ ষাটখানা করে স্পেশাল ট্রেণ প্রত্যহ কেবল আসছে—

ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান থেকে হরিদ্বারে যাত্রী নিয়ে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি দেখে।

প্রথম দিন গিয়ে দেখেছিলুম দুধ চার আনা সের, পুরী আট আনা। দ্বিতীয়দিন দেখলুম দুধ ছ' আনা, পুরী দশ আনা। তৃতীয় দিন দেখলুম দুধ আট আনা, পুরী বারো আনা। তখন আর মাত্র একদিন বাকী অর্থাৎ কুম্ভমেলার আগের দিনের বাজার হ'লো এই। অতটুকু একটা ছোট জায়গায় এত জনসমাগম হয়েছে যে গভীর রাত্রে মনে হয় যেন দূর থেকে একটা হাটের কোলাহল ভেসে আসছে।

কুম্ভস্নানের পূর্ব্বদিন আমি কঙ্খলে দক্ষ প্রজাপতির ঘাটে স্নান করতে গেলুম তাঁবুর কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে এঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ পরিচয় জমে উঠেছিল।

স্নান শেষ ক'রে কঙ্খলের দেবমন্দিরগুলি দর্শন করে আমরা সকলে একটা হোটেলে ঢুকলুম ভাত খাবার জন্যে। চার আনা করে পয়সা দিয়ে আমরা খেলুম, চারটী ভাত, ডাল ও দুটো নিরামিষ তরকারী। তারপর ভীড় ঠেলতে ঠেলতে এসে যখন পৌঁছলুম আমাদের ধর্ম্মশালার দোরে তখন বেলা প্রায় বারোটা।

দরজার কাছে একটা অন্ধ ভিখিরী দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল। পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়সা বার করতে গিয়ে চমকে উঠলুম! একি আমার 'মনিব্যাগ' কোথায় গেল!

সঙ্গীদের বললুম। তাঁরা নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, পকেট মেরেছে, এত ভীড়ে কখনো পয়সা-কড়ি পকেটে রাখে মশায়?

আমি বরাবর ভিতরে ফতুয়ার পকেটে ব্যাগটা রেখে আসছি কোনদিন ত কিছু হয়নি, আজ কেন হলো?

সঙ্গীরা বললেন, আরো আগে হওয়া উচিত ছিল—হয়নি সে আপনার ভাগ্য জানবেন।

আমার বুকের মধ্যে তখন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। জিভ শুকিয়ে উঠলো। এখনি ফিরে যে রোহিণীবাবুকে টাকা দিতে হবে! ক'দিন ধরে তাঁকে ঘুরিয়েছি, আজ ত আর নিস্তার নেই। আমার শেষ সম্বল সমস্তই ত ওর মধ্যে! কি হবে?

সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন ছিল আমারই সমবয়সী। তাদের আমি তখন সমস্ত কথা খুলে বললুম।

তাঁরা বললেন, আরে মশাই আস্তে আস্তে ভেগে পড়ুন এখান থেকে, এই ভীড়ের মধ্যে রোহিণীবাবুর বাবাও ধরতে পারবে না। বরং আমরা আপনার স্যুটকেশটা এনে দিচ্ছি আপনি আর ভিতরে ঢুকবেন না।

আমার ভদ্রতায় কেমন বাধতে লাগল। একটু ইতস্তত করছি দেখে সঙ্গীরা আবার বললেন, কিছু ভাববেন না, এ-রকম বিপদে সকলকেই পড়তে হয়, চুরী গেছে তাই, আপনি ত আর ইচ্ছা করে রোহিণীবাবুকে ঠকাচ্ছেন না, তাছাড়া ও যা লোক, আপনাকে যে পয়সা না পেলে ছেড়ে দেবে, তা মনেও করবেন না। একটা পয়সা ওর গায়ের রক্ত!

তাঁদের এই কথায় তখন অনেকটা সান্ত্বনা পেলুম সত্যিকথা। যদিও আগে থেকে আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলুম যে রোহিণীবাবুকে কিছু টাকা দিয়ে অনুরোধ করবো গরীব বলে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আমার সমস্ত কল্পনা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। একটি পয়সা কাছে নেই—আমি একেবারে পথের ভিখিরী। একে বিদেশ, তায় আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত কোন লোকও সেখানে নেই। কেমন করেই বা দেশে ফিরবো, কিই বা করবো ভাবতে গিয়ে যেন মাথা

গোলমাল হয়ে গেল। দেশ থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে এসে পড়েছি যে!

সঙ্গী দু'জন আমার বিছানা ও সুটকেশটা তাঁবুর ভেতর থেকে এনে দিলেন এবং কিছু কিছু পয়সা হাতে দিয়ে বললেন, যা ভীড়, একবার গাড়ীর ভেতর উঠতে পারলে আর কে টিকিট চেক করে! আপনি লাইনের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসুন। ভয় কি? ইয়ংম্যান, তায় একলা। হাওড়ার আগে কোন একটা ষ্টেশনে নেমে পড়বেন, ব্যস্। সরে পড়ুন শিগ্‌গির, আর দেরী করবেন না। এই ব'লে একরকম জোর করেই তাঁরা আমায় সেখান থেকে পাঠিয়ে দিলেন।

আমিও তাঁদের নমস্কার ক'রে ষ্টেশনের পথ ধরলুম।

কিন্তু বিপদ হ'লো ভারী! যত জোরে পা চালাতে যাই কিছুতেই তত জোরে চলে না। দু'পা যাই আর একবার করে পিছন ফিরে দেখি; কেবলই মনে হয়, ওই বুঝি রোহিনীবাবু এসে পড়লো।

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে যেই পুলটা পেরিয়ে ওপারে পা দিয়েছি অমনি ভীড়ের মধ্যে থেকে কে আমার জামাটা টেনে ধরলে, পিছন ফিরে দেখি রোহিণীবাবু! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। তিনি পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় বললেন, কি, দিব্যি গা ঢাকা দিচ্ছেন যে! টাকাটা বুঝি দিতে হবে না?

ভয়ে তখন আমার সমস্ত দেহ ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে, জিব যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে—কোনমতে রোহিণীবাবুর হাতটা ধরে বললুম, দাদা আমার সমস্ত চুরি হ'য়ে গেছে। দেশে ফিরে গিয়ে আপনার টাকা পাঠিয়ে দেবো, দয়া করে আপনার ঠিকানাটা যদি দেন।

একটা কুৎসিত ভাষা ব'লে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। তারপর

আমার গলার জামাটা চেপে ধরে বললেন, তোমার মত ঢের ঢের জোচ্চোর দেখেছি—টাকা না দিলে আমি এক পা যেতে দেবো না।

আমি বললুম, বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক দেশে গিয়ে—

তিনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আরে রেখে দাও তোমার বিশ্বাস। বিশ্বাস করে প্রথমদিন টাকাটা নিইনি ব'লে পালাচ্ছিলে আমার চোখে ধুলো দিয়ে! আমি তাঁবুতে গিয়ে যদি না এখুনি তোমার খোঁজ করতুম ত তোমায় আর পায় কে?

দেখতে দেখতে আমার চারিপাশে ভীড় জমে গেল। সবাই আমায় চোর মনে করে নানারকম ঠাট্টাতামাসা করতে লাগল। জনতার মধ্যে কত রকমের, কত জাতির নরনারী। আমি লজ্জায় আর তাদের দিকে মাথা তুলতে পারলুম না। কেউ বললে, পুলিশে দাও; কেউ বললে, বেশ করে দু-ঘা বসিয়ে দাও, টাকা এখুনি বেরিয়ে আসবে। শুধু কয়েকজন বিহারী যুবক এসে আমায় জিজ্ঞেস করলে, বাবুজী, ব্যাপার কি?

আমি তাদের সমস্ত কথা খুলে বললুম। কুড়ি টাকা একটা সিটের জন্যে ভাড়া শুনে তারা বললে, এ কি ডাকাতি নাকি? ঐ একটা গোটা তাঁবুর ভাড়াই যে মোটে পঁচিশ টাকা, আমরা জানি না!

রোহিণীবাবুকে তারা উল্টে জোচ্চোর বানিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটা তীর্থ করতে এসে যাত্রীদের ঠকিয়ে বেশ পয়সা উপার্জ্জন করছে—দেবেন না একটাও টাকা।

এই ব'লে তারা আমায় সদুপদেশ দিয়ে চলে গেল।

রোহিণীবাবুর রাগটা তখন আমার ওপর আরো বেড়ে গেল। তিনি আমায় নানারকম কটূক্তি করতে লাগলেন। ভীড়ের ভিতর থেকে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই শুনে রোহিনীবাবুকে বললেন, লজ্জা করছে না

আপনার কুড়ি টাকা চাইতে? আপনি না বাঙ্গালী, আপনি না হিন্দু, এখানে এসেছেন ধর্ম্ম করতে!

আর একজন কে বললে, ধর্ম্ম না ছাই, পকেট না মেরে এই সুযোগে দু'পয়সা হাতাতে এসেছে। অনেকগুলি বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীর ভীড় হয়েছিল আমার চারদিকে। তাদের মধ্যে থেকে একজন আমায় বললে, মশায়, পাঁচটাকার এক আধলা বেশী দেবেন না—দেখি ও কেমন করে আদায় করতে পারে!

রোহিণীবাবুর মুখ তখন অপমানে বেগুনি হয়ে উঠেছে।

তিনি কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললেন, অত যদি দরদ ত পাঁচটা টাকাই না হয় পকেট থেকে দিয়ে কথা বলুন না! দেখি কার মুরদ কত!

তখন সবাই চুপ। কারুর মুখে কোন কথা নেই। এক একজন করে সব চুপি চুপি সরে পড়তে লাগল।

এমন সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে কে ব'লে উঠলো, আমি দিচ্ছি। চলে আসুন আমার সঙ্গে।

কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলুম। মাথা তুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, দিদি!

রোহিণীবাবুকে ইতস্তত করতে দেখে দিদি বললেন, চলে আসুন আমার সঙ্গে আমি টাকা দিচ্ছি—এ যে আমার ভাই। এই ব'লে তিনি এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরলেন।

রোহিণীবাবু তখন একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন দেখুন, আমি বড় গরীব, তাই—

দিদি তাঁর মুখের ওপর বললেন, তা জানি, সেই জন্যেই ত আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে বলছি।

সুদূরের পিয়াসী

ব্যস্, সব ঠিক হয়ে গেল। দিদির সঙ্গে আমি এবং আমার পিছনে রোহিণীবাবু যেতে লাগলেন।

ভোলাগিরির মন্দির থেকে কয়েক গজ দূরে, পিছনের দিকে একটা স্বতন্ত্র বাগান, তার মধ্যে সারি সারি উলুখড়ের দেওয়াল দেওয়া নীচু নীচু কুঁড়ে ঘর, অনেকটা আমাদের দেশের সাঁওতালদের ঘরের মত। তার না আছে জানলা, না আছে কিছু—চারিদিকে উলুখড়ের দেওয়াল, বাঁখারী দিয়ে বাঁধা, শুধু সামনেটা দরজার মত খানিকটা ফাঁকা। আবার মাটির ওপর কতকগুলো উলুখড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে যে যার আশ্রয় নিয়েছে। দিদি এইরকম একটা ঘরের ভিতর আমাকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন। রোহিণীবাবু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাদাবাবু কম্বলপাতা বিছানার ওপর শুয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তাঁর মুখটা কেমন হয়ে গেল। বিরক্তিকরস্বুরে বললেন, আবার একে কোথা থেকে জোটালে?

দিদি তখন তাঁকে যা যা ঘটেছিল সব বললেন। কিন্তু পাঁচটা টাকা যেই আমার হয়ে রোহিনীবাবুকে দেবার কথা বললেন, অমনি তিনি রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলেন, পয়সা একেবারে খোলামকুচি, না? পথে ঘাটে পড়ে আছে! কোথাকার কে তার জন্যে আমার মাথা-ব্যথায় ঘুম হচ্ছে না। ওসব হবে না—রোহিণীবাবুকে চলে যেতে বলো।

দিদি বললেন, কিন্তু আমি যে তাঁকে কথা দিয়ে ডেকে এনেছি।

কণ্ঠে একপ্রকার সুর টেনে দাদাবাবু বললেন, তা যেমন ডেকে এনেছো তার ব্যবস্থা করো; যেখান থেকে পারো টাকা দাও। মোদ্দা আমার কাছে একটি পয়সা নেই।

অপমানে আমার চোখ মুখ দিয়ে আগুনের ঝাঁজ বেরুতে লাগল।

আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। দিদিকে একটা নমস্কার করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দিদি কোন কথা না ব'লে শুধু আমার চিবুক স্পর্শ করে নিঃশব্দে তাঁর হাতটা মুখে ঠেকালেন। তারপর আমি বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, শোন।

সে কণ্ঠস্বরকে অমান্য করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘরের ভিতর গেলুম! দিদি তাঁর হাত থেকে একগাছি সোণার চুড়ি খুলতে খুলতে বললেন, এইটে বিক্রী ক'রে এখনি রোহিণীবাবুকে টাকা দাওগে, তারপর কলকাতায় ফিরে আবার আমায় এক গাছা চুড়ি কিনে দিয়ো।

এই ব'লে তাঁর বাড়ীর ঠিকানাটা আমায় জানিয়ে দিলেন।

আমি ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম।

তিনি বললেন, লজ্জা কি, তুমি না পুরুষমানুষ? মানুষের বিপদ-আপদ হয়েই থাকে, তাই বলে কি আপনার দেশের লোককে কেউ ফেলতে পারে না কি? নাও ধরো।

আমি চুড়িটা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দাদাবাবু নীরব দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে আর একবার দিদির মুখের দিকে শুধু তাকালেন।

দিদির চুড়ি বিক্রী করা টাকা রোহিণীবাবুকে দেবার পরেও আমার কাছে যা ছিল তাতে করে দেশে ফেরবার একখানা টিকিট কেনা যায়। কিন্তু পরের দিন কুম্ভস্নানটা সেরে তবে হরিদ্বার ত্যাগ করবো এই মনে করে ভোলাগিরির মন্দিরের একপাশে একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে বিছানাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইভাবে আরো বহু ভদ্রলোক সেখানে শুয়েছিলেন।

সুদূরের পিয়াসী

সন্ধ্যেবেলাটা মন্দিরের পূজা আরতি দেখে কাটিয়ে দিলুম এবং রাত্রে সেইখানেই চারটি ভোগ খেলুম। পয়সা লাগে না এখানে ভোগ খেতে। যত যাত্রী আসুক না কেন সবাই এমনি খেতে পায়। প্রথম একখানা করে ঘিয়ে ভাজা মালপো, তারপর ভাত, ডাল ও একটা তরকারী। এই হ'লো ভোগ। ভোলাগিরির শিষ্য অসংখ্য। হাজার হাজার টাকা তাঁরা এই আশ্রমে দান করেন। শুনলুম শুধু বাঙ্গালা নয়, ভারতের সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি। এত অধিক শিষ্য আজকালকার দিনে এক রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া বোধহয় আর কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের নেই। আশ্রমের এই ব্যবস্থাটি সত্যই বড় ভাল লাগল। মুক্ত হস্তে অবারিত দান! সবাই শালপাতা বিছিয়ে সার সার বসে গেছে সেই বিরাট প্রাঙ্গনে—জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই, বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। এই ত ধর্ম্মের আসল রূপ, এইত সাধুর সাধুত্ব!

ঘুমিয়ে ছিলুম। রাত্রির বারোটার সময় একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আগুন, আগুন ব'লে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো। বিছানা ও সুটকেশটা পাশের ভদ্রলোকের কাছে জমা রেখে ছুটলুম সেই দিকে।

সর্ব্বনাশ! গিয়ে দেখি যে দিদিদের সেই খড়ের ঘরগুলো জ্বলছে দাউ দাউ করে। নীচু নীচু ঘর, সবাই তখনও ছেলে মেয়ে নিয়ে বেরুতে পারেনি। ভয়ার্ত্ত নরনারী ব্যাকুল হ'য়ে চীৎকার করছে।

আমি ছুটে দিদির ঘরের কাছে গেলুম। দেখি দিদি ও তাঁর ননদ বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু দাদাবাবু তখনও জিনিষপত্র নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরুতে পারেন নি। দিদি আমাকে দেখে বললেন, শিগ্‌গির ওঁকে ঘর থেকে বার করে আনো ভাই।

আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই মধ্য দিয়ে কোন রকমে

ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলুম।

বাইরে এসে দাদাবাবু চীৎকার ক'রে বললেন, আমার বাক্স—বাক্স কোথায় গেল—তার মধ্যে যে আমার টাকা কড়ি, যথাসর্ব্বস্ব রয়েছে। দেখনা ভাই একটু ভেতরে। কণ্ঠে তাঁর সর্ব্বহারার ব্যাকুলতা!

আমি আবার ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, কিন্তু বাক্সটা হাতে করে যেই বেরিয়ে আসতে যাব অমনি একটা কাঠের খুঁটিতে মাথা লেগে ঘুরে পড়ে গেলুম। মাথা ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। দিদি চীৎকার করে উঠলেন।...

তারপর কি হ'য়েছে জানি না, পরের দিন বেলা বারোটার সময় যখন চোখ খুললুম দেখি আমি একটা হাসপাতালে শুয়ে আছি। গেরুয়া পরা কতকগুলি সন্ন্যাসিনী রোগীদের সেবা করছেন। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।...এ হাসপাতালটা একটু নতুন রকমের। মেলা উপলক্ষে কি একটা সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত। শুনলুম এই সঙ্ঘের অধিনেত্রী একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী, সেবাকার্য্যের জন্য তাঁদের আশ্রম ত্যাগ করে দলবেঁধে এখানে এসে হাসপাতাল খুলেছেন।

যে নার্স টি আমার সেবা করছিল, সে চুপি চুপি বললে, ভয় নেই, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, আপনার ওপর মাতাজীর খুব দয়া!

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কেমন ক'রে জানলেন?

সে বললে,আপনাকে ত ওরা সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল, উনি কেমন করে দেখতে পেয়ে জোর করে এখানে নিয়ে এলেন। তাও সাধারণ তাঁবুতে থাকতে দিলেন না, নিজের তাঁবুটা ছেড়ে দিয়ে উনি নিজে একটা ছোট তাঁবুতে গেছেন!...ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপনার খবর নিয়ে যাচ্ছেন!

ব্যাপার কি বুঝলুম না, তখন আমার ভাববার অবস্থাও নয়, চোখ বুজে পড়ে রইলুম। তারপর কথাটা ভুলেই গেলুম।

প্রকাণ্ড একটা বাগান ঘিরে এই হাসপাতাল বসেছে। নানা রকমের ওয়ার্ড এখানে ওখানে, ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে। আমি যে ওয়ার্ডটায় ছিলুম তাতে রোগী অল্প—আমায় নিয়ে বোধ হয় পাঁচজন। এই রকমের ছোট ছোট অস্থায়ী হাসপাতাল আরো অনেক আমি সেখানে দেখেছিলুম।

আমার তাঁবুর পাশে ছিল কলেরা ওয়ার্ড—সেখানে শুনলুম রোগী বেশী। কেন না সম্প্রতি মেলাতে দু-চার জায়গায় কলেরা দেখা দিয়েছিল। বড়-বড় ডাক্তার আছেন অনেকগুলি কিন্তু নার্সের কাজ করেন সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারা। এঁরা আশ্রমবাসিনী, সন্ন্যাসিনী—মানবের সেবাই এঁদের ধর্ম্ম, এঁদের সন্ন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। এঁদের দেখে আমার মনে হতো এঁরা এক একজন এক-একটি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল—মূর্ত্তিমতী সেবা। সকল জাতির মেয়েই আছে এই সঙ্ঘে, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

হাসপাতালকে আগে আমি ভয়ের চোখে দেখতুম, মনে হ'তো ওর মত নির্ম্মম স্থান আর হয় না—বিশেষ করে আমাদের কলকাতায়। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, একজনের কষ্টে আর একজন ব্যথা পায় না, শুধু পয়সা দিয়ে যে যতটা কাজ আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু এখানে আমার সে ভুল ভাঙ্গল। মেয়েরা সবাই স্বেচ্ছায় এই কাজ করে, এর জন্যে পারিশ্রমিক লাগে না। পয়সার লোলুপতা যেখানে নেই সেখানেই আছে অন্তর! তাই মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম—ভালই হয়েছে মাথা ফেটে গিয়ে! তবু নতুন অভিজ্ঞতা হ'লো।

আটদিন ধরে তাঁদের সযত্ন সেবায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। জ্বর

গেল, মাথার ব্যথা গেল। তবে ঘা শুকোতে আরো আট-দশদিন লাগবে ডাক্তার বললেন। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে কেবলই আমার দিদিকে মনে পড়তে লাগল। একবারও ত তিনি এলেন না, বা দেখলেন না আমি বেঁচে রইলুম কিনা! মনে বড় দুঃখ হলো! তার ওপর যখন শুনলুম মেলার যাত্রীরা সব চলে গেছে, হরিদ্বার একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তখন সত্যিই আমার চোখে জল এসে পড়লো। দিদি যে এত নির্দ্দয় হবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! অন্তত এখান থেকে চলে যাবার আগে একবার দেখতে আসবেন এই আশায় প্রতিদিন আমি বাইরের দিকে পথ চেয়ে থাকতুম।

একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করে বিছানায় শুয়েছিলুম। তাঁবুর মধ্যে টিপ টিপ করে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছিল। শরীর খুব দুর্ব্বল। নিজের জীবনের কথা ভাবছিলুম, এমনি করে আর কতদিন চলবে পরকে নিয়ে। নিজের বলতে কি কাউকে কোনদিন পাবোনা? যে আমায় ত্যাগ করতে পারবে না, আমি যাকে ত্যাগ করতে পারবো না, এমন একজনও কি আমি পাবো না কোনদিন? জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো ত কেটে গেল এমনি স্নেহের কাঙ্গালপনায়। পর যে চিরকালই পর হয়ে রইলো, কখনো আপন হলো না—সেই কথাই বার বার মনে পড়ছিল, আর মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলুম, হে ভগবান আমায় অন্তত এমন একজন লোক দাও, যাকে একান্ত আপনার বলে ভাবতে পারি। এমন সময় হঠাৎ একটা ডাক শুনে আমি চমকে উঠলুম, এই দুধটুকু খেয়ে নিন!

চোখ খুলে দেখলুম সামনে সেই সন্ন্যাসিনী, চন্দ্রনাথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল চার বছর আগে। তার হাতে ফিডিং কাপ, কপালে একটা ছোট্ট চন্দনের টিপ, রুক্ষ চুল কপালের ওপর থেকে ঝুলে পড়েছে।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসিনী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বাঁহাতে আমার চিবুকটা তুলে ধরে ডানহাতে সেই ফিডিং কাপের নলটা আমার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, হাঁ করুন।

আমি মুখটা সরিয়ে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে তার কপাল থেকে তুটি গুচ্ছ চুল আমার মুখের ওপর এসে পড়লো। সন্ন্যাসিনী বললে, খাবেন না, ক্ষিদে পায়নি ?

আমি বললুম, ক্ষিদে পেয়েছে তবে তোমার হাতে খাবো না।

তার হাতটা যেন কেঁপে উঠলো। তবু মুখে হাসি টেনে এনে বললে, কেন, তাতে জাত যাবে নাকি !

কঠিন স্বরে আমি বললুম, হাঁ, ঠিক তাই।

খেয়ে নিন, এই বলে আবার মুখের কাছে তুধের পাত্রটি নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে সে বললে, বোকা, সন্ন্যাসিদের কি কোন জাত থাকে ?

আমি মুখের কাছ থেকে ফিডিং কাপটাকে সরিয়ে দিয়ে বললুম, জাত থাকে না কিন্তু ধর্ম্ম ত থাকে ?

ধর্ম্ম ! বিস্মিত হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, মানুষের সেবাই ত আমাদের ধর্ম্ম !

অকস্মাৎ তাকে আঘাত করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, বলে ফেললুম, সেই জন্যে বুঝি স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে সেবা করবার উদ্দেশ্যে কুলত্যাগ করলে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, রূপে, গুনে বিদ্যায় জ্ঞানে এমন মানুষ কটা পাওয়া যায় ! তাছাড়া তোমার কথা শুনে যে লোকটা পাগল হয়ে যায়, এত ভালবাসতো তোমাকে, তাকে ছেড়ে তুমি কিনা কুলত্যাগ করলে একটা বাজে লোকের সঙ্গে !

আমার মুখে খপ্ করে একটা হাত চাপা দিয়ে সন্ন্যাসিনী বললে, চুপ করুন! আপনার পায়ে পড়ি ওকথা আর আমায় শোনাবেন না।

মুখ থেকে তাড়াতাড়ি তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললুম, পাটনার ব্রজেন বাগচীকে চেনো?

নিমেষে সন্ন্যাসিনীর মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো। সে যেন কি বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। তার ঠোঁটদু'টো নিঃশব্দে শিউরে উঠলো শুধু।

আমি আবার বললুম, শ্রীমতী মেনকা দেবীর স্বামী ব্রজেন বাগচী—চেনো না তাঁকে?

চাপা স্বরে সে বললে, সে মেনকাদেবী আর বেঁচে নেই, মরেছে!

আমি বললুম, কিন্তু তাঁর স্বামী এখনো জীবিত আছেন, আর তাঁর স্ত্রীর শোকে তিনি উন্মত্তপ্রায়!

সন্ন্যাসিনী আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে অপরাধীর মত চলে যাচ্ছিল। আমি তার হাতটা জোর করে চেপে ধরে বললুম, একটা কথা আমায় সত্যি করে বলবে?

ধীরে ধীরে সে বললে, বলুন।

বললুম, আচ্ছা মেয়েমানুষ কি চায় বলতে পারো? আমি আজও বুঝতে পারলুম না।

আমার হাতের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সন্ন্যাসিনী বললে, আজ নয় আর একদিন বলবো। এই বলে ধীর ও নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চুপ করে দরজার দিকে চেয়ে শুয়ে রইলুম। ঐটুকু উত্তেজনাতেই তখন আমার ক্লান্তি এসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আর একজন সন্ন্যাসিনী এসে আমায় দুধটা খাইয়ে গেল। আমি তাকে পূর্ব্ববর্ত্তিনী সন্ন্যাসিনীর কথা জিজ্ঞেস করলুম।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনীটি এখানে কি করে জিজ্ঞেস করতে সে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললে, উনিই যে মাতাজী! আশ্রমের অধিনেত্রী।

বুঝলুম উনিই তাহলে এই সঙ্ঘের সর্ব্বেসর্ব্বা! আর কোন কথা তাকে না জিজ্ঞেস করে চুপচাপ শুয়ে রইলুম। ভাবতে লাগলুম যার অধিনেত্রী এইরকম তার সঙ্ঘটি না জানি কেমন।

কিন্তু, তাকে তখন সামনে দেখে মনটা যেভাবে হঠাৎ বিষিয়ে উঠেছিল, এখন যেন আর তেমন মনে হ'ল না। বরং যতই তার কথা ভাবতে লাগলুম, ততই তাকে আর একবার দেখবার, তাকে দু'টো প্রশ্ন করার ইচ্ছা অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। এ কী শুধু কৌতূহল?···কে জানে, এ কি!

পরদিন সকালে যখন সেই সন্ন্যাসিনীটি আমায় খাবার দিতে এলো তখন বেলা দশটা। আমি তাকে বললুম, একবার আপনার মাতাজীকে ডেকে দিতে পারেন?

সে বললে, মাতাজী তো আজ চলে গিয়েছেন আশ্রমে—তাঁর সঙ্গে ত আর দেখা হবে না।

আমি বললুম, সেকি! আর একবারও হবে না?

সন্ন্যাসিনী বললে, না। এখানে তিনি আর আসবেন না, এখন দেখা করতে হ'লে আশ্রমে যেতে হবে। আর আটদিন পরে আমাদের হাসপাতালও উঠে যাবে। তখন আমরাও সব আশ্রমে ফিরে যাব।

আমি বললুম, সে আবার কোথায়?

যেতে যেতে সে বলে গেল, দেরাদূনে।

দশম পরিচ্ছেদ

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম তখন সমস্ত হরিদ্বার শহরটিকে মনে হলো যেন আবার নতুন করে দেখলুম। ভীড় নেই, কোলাহল নেই, রাস্তার ধারের দোকানপাট সব উঠে গেছে। তাঁবু, অস্থায়ী চালাঘর প্রভৃতিরও আর কোন চিহ্ন নেই। পনেরো দিন পূর্ব্বে কুম্ভমেলা শেষ হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এখন যে যার বাড়ী চলে গেছে। বিয়ের পরের দিন সকালে কনের বাড়ীর অবস্থা যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম ভাব। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত স্থুর যেন সর্ব্বত্র। বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু নীরব। তাদের কক্ষে কক্ষে এতদিন যে শত শত কণ্ঠের কোলাহল বেজে উঠেছিল আজ যেন তারি বিরহে তারা ম্লান। পথঘাট জনশূন্য—কদাচিৎ কোন পথিক নজরে পড়ে। অতিরিক্ত খাদ্য-সম্ভারপূর্ণ দোকানগুলি ভারমুক্ত হয়ে বিশ্রাম করছে।

গঙ্গার ঘাটও নির্জ্জন। তার বুকের ওপর অস্থায়ী পুলগুলি আর নেই। দড়ি বাঁশ ও শালের খুঁটির কঠিন বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে সে এখন বেঁচেছে। তার গর্জ্জন, তার ফোঁসফোঁসানি থেমে গেছে, তার দেহে আর জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। মুক্তির আনন্দে সে শান্ত, সমাহিত। নীল স্বচ্ছ জলরাশি দুকূল পরিপ্লাবিত করে যেন আনন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। আর তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে—একদিকে আকাশের গায়ে আঁকা হিমালয়ের অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ, অন্যদিকে অগণিত প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যরাজী। এই অট্টালিকাগুলির দিকে চেয়ে আমার মনে হল মানুষ এদের তৈরী করেনি। ওই আকাশ,

সুদূরের পিয়াসী

ওই জলরাশি, ওই তরঙ্গায়িত হিমালয়, ওই বৃক্ষলতা-শোভিত সুনিবিড় বন, সব যেন একজনের হাতে তৈরী। একই সুর সবার অন্তরে প্রবাহিত। কোন সুরশিল্পী অলক্ষ্যে থেকে একই সুরে বিভিন্ন যন্ত্রগুলিকে বেঁধে দিয়েছেন, তাদের ঐক্যতান শোনবার জন্য।

বাস্তবিক প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তবের এমন মহামিলন আর কোথাও দেখিনি। আমার মন জুড়িয়ে গেল। সর্ব্বাঙ্গে একটা শান্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগলুম। এই ত হরিদ্বারের আসল রূপ! পুণ্যের নামে ভীড় ক'রে যারা জনতার সৃষ্টি করে তারা এর শান্তিভঙ্গ করে, পবিত্রতা নষ্ট করে, তারা স্বর্গরাজ্যে ঢোকে অসুরের মত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আমি যদি কোনদিন ভারতবর্ষের ডিক্টেটারী শাসন হাতে পাই ত আগে এই রেললাইনগুলোকে তুলে দেবো এখান থেকে।

বহুক্ষণ ধরে আমি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ালুম। দেখে যেন আশা মেটেনা—যত দেখি তত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে যখন ব্রহ্মকুণ্ডে এলুম তখন দেখি বেদগান হচ্ছে। ঘাটের ওপর কুশাসন পেতে সারি সারি বসেছে কতকগুলি তরুণ কিশোর। তাদের নেড়ামাথা, কপালে শ্বেতচন্দনের রেখা, খালি গা, পরণে বৃন্দাবনী ছাপা ধুতি! এরা ব্রহ্মচারী। কোন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম থেকে গুরুর সঙ্গে এসেছে এখানে। তারা সকলে সুর করে বেদপাঠ করছে। বিশুদ্ধ তাদের উচ্চারণ, সুললিত কণ্ঠস্বর। আমি তাদের পাশে গিয়ে বসে রইলুম। শুনলুম তারা প্রত্যহ আসে সেখানে এবং স্নান ক'রে বেদ পাঠ ক'রে আবার আশ্রমে ফিরে যায়। তাদের দেখে প্রাচীনকালের তপোবনের কথা আমার মনে পড়লো। আর একদিন ব্রহ্মকুণ্ডর এই ঘাটে সন্ধ্যার সময় আরতি দেখেছিলুম। প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে

করে দীর্ঘদেহ গৌরকান্তি পুরোহিত আরতি করছেন গঙ্গা দেবীকে। ঘণ্টা বাজছে, ধূপ দীপ ও ফুলের গন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। গঙ্গার জলে সেই আরতি-প্রদীপের প্রতিবিম্ব দেখেছিলুম কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর শাঁখ-ঘণ্টার মিলিত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার কলস্রোতে, ওপারের অন্ধকার বনে ও পর্ব্বত শ্রেণীর নিস্তব্ধ বক্ষে। বাতাসে কান পেতে থাকলে মনে হয় যেন আরো দূরে, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে সেই ধ্বনি—বুঝি আকাশের তারাগুলি কেঁপে ওঠে তার স্পর্শে, চাঁদের বুকেও লাগে তার ঢেউ। সেদিন ও এদিনের স্মৃতি আমাকে কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললে যেন আমি এই বিংশ শতাব্দীর জামাজুতোপরা সভ্যমানুষ নই, আমি কোন শকুন্তলার তপোবনে এসে পড়েছি রাজা তুষ্মন্তর মত।

ব্রহ্মকুণ্ডর ঘাটে অনেকক্ষণ বসে বসে এই সব ভাবছিলুম। শেষে টাওয়ার ক্লকের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজার শব্দ শুনে আমার হুঁস হলো। আমি তখন ভোলাগিরির মন্দিরে ফিরে গিয়ে আমার বিছানা ও সুটকেশটার খোঁজ করতে লাগলুম। একজন মহারাজ অফিস থেকে খোজ নিয়ে এসে আমায় ভিতরে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমার জিনিষ আমায় বেছে নিতে বললেন। বিছানা ও সুটকেশ ফিরে পেয়ে আমি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম।

মন্দির ছেড়ে রাস্তায় পা দিতেই আর একজন মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সবে স্নান করে এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল নিয়ে ঘাটের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। আমায় চলে যেতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, কতদূর যাবেন?

আমি বললুম, কলকাতায়।

তিনি জবাব দিলেন, এখন ত গাড়ী নেই, সেই সন্ধ্যেবেলায়।

বললুম, তাই নাকি?

একটু হেসে তিনি বললেন, আপনি কি গাড়ীর সময় জানেন না?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, আজ্ঞে না, ভেবেছিলুম ষ্টেশনে গিয়ে সময়টা দেখে নেবো।

তিনি বললেন, ষ্টেশনে মিছিমিছি গিয়ে কি করবেন, ততক্ষণ আমাদের ধর্ম্মশালায় গিয়ে থাকুন। তারপর সন্ধেবেলা চলে যাবেন।

আমি বললুম, আপনাদের ধর্ম্মশালায় থাকতে কি কোন খরচ লাগে?

তিনি বললেন, রোজ এক পয়সা করে মেথরের খরচা ছাড়া আর কিছু লাগে না। আর আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের এখান থেকে রোজ ভোগ খেয়ে যেতে পারেন। তাতেও পয়সা লাগবে না।

আমার কাছে যে বিশেষ পয়সাকড়ি নেই বোধহয় তিনি আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। আমি আবার প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা আপনাদের ধর্ম্মশালায় ক'দিন থাকার নিয়ম?

তিনি বললেন, সাতদিন।

আমি আর কোন কথা না বলে তাঁকে একটা নমস্কার করে সোজা ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলুম।

সুন্দর ধর্ম্মশালা। লালরঙের পাথরের তিনতালা বাড়ী একেবারে গঙ্গার গর্ভ থেকে উঠেছে। একতালার ভিতর দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে গঙ্গার ঘাটে। তিনতালার ওপরের একখানি ঘর ম্যানেজার বাবু আমায় দিলেন। সে কি ভীষণ উত্তেজনা। মনে হ'লো, গঙ্গার মধ্যে আমি যেন শুয়ে আছি, জানলা দিয়ে যেদিকে চাই দেখি জল—সামনে,

বামে ডাইনে,—চারিদিক থেকে কুলকুল ধ্বনি আমার কানে আসছে। অথচ এই স্বর্গরাজ্যে থাকতে একপয়সা খরচা লাগে না। তার ওপর খাওযাও বিনা-মূল্যে। এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যের জন্য আমি ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালুম!

একদিন দু'দিন করে সেখানে পাঁচদিন কেটে গেল। রোজই সকালে মনে করি আজ চলে যাবো কিন্তু সন্ধ্যা হলে আর যেতে ইচ্ছা করে না। কেবলই মনে হয আর একটা দিন যদি থেকে যাই! এমনি করে অবশেষে আমি সেখানে রয়ে গেলুম শেষ দিন পর্য্যন্ত।

সপ্তম দিন সকাল থেকে আমার মন খারাপ হতে লাগল। আজ বিদায় নিতে হবে হরিদ্বার থেকে! বিদায় ত নেবো কিন্তু তারপর যাবো কোথায়? এই চিন্তায় মন যেন অধীর হয়ে উঠলো। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ভেবেছিলুম সেই দিনই কলকাতায় চলে যাবো। কিন্তু আজ মনে হতে লাগল কেন সেখানে যাবো! নামে একটা দেশ আছে, সংসারও আছে, কিন্তু আমি ত সেখানে অবাঞ্ছিত অতিথি। তারা ত কেউ আমায় চায় না। আমার অভাব কি কেউ সেখানে অনুভব করে? না-না-না, কেউ করে না। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে যার আপনার বলতে কেউ নেই, তার কে আছে? বিশেষ ক'রে আমার মত বেকার যুবকের।

বিদায়ের দিনে খুড়ির কথাটা মনে পড়ে গেল। চোখে হাত দিয়ে দেখি কখন জল এসে পড়েছে। জল মুছে ফেলে মনকে দৃঢ় করে বলি, ছিঃ, আমি না পুরুষ! সত্যিই, কেন সংসারের লোক, কেন দেশের লোক আমার কথা চিন্তা করবে? তাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আমি তাদের কি দিয়েছি? দেওয়ার মধ্যে দিয়েই ত মানুষ নিজে পায়,

তবে কেন আমি প্রত্যাশা করি তাদের কাছে! ভাবতে ভাবতে আবার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। চীৎকার করে মনের মধ্যে প্রশ্ন করি, তবে কি আমার আপন বলতে সত্যিই এই পৃথিবীতে কেউ নেই?

উত্তর পাই না কিছু। পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখি অন্ধকার। প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়লো। তখন ভাবতুম সংসারে যার কোন বন্ধন নেই সে-ই ভাগ্যবান, সে-ই সুখী। কিন্তু আজ কেবলই মনে পড়তে লাগল তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে বুঝি আর কেউ নেই। অনাহারে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, স্নেহের অভাবে তেমনি মানুষের মনও সুস্থ থাকে না—কুঁকড়ে, শুকিয়ে, মুচ্‌কে যায়। তাই মানুষ স্নেহ চায়, ভালবাসা চায়, বন্ধন চায়। মা বাপ ভাইবোন স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন মানুষের এই ক্ষুধা মেটায় নানারূপে। দেশ বলো, সংসার বলো, সবই এদের মধ্যে। স্নেহের আকর্ষণ, আপন জনের আকর্ষণ আছে বলেই ত দেশকে ভাল লাগে, সংসারকে মধুর মনে হয়!

হঠাৎ আমি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলুম। সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হতে লাগল আমার দেশ নেই, আমার ঘর নেই, আমার সংসারে কেউ নেই। যারা আছে তারা আমার কাছে মিথ্যা একটা ছায়াবাজী। আমি একা। শুধু পথ, সুদূরের পথ আমার আপন। তারি ধারে ধারে আমি যে স্মৃতি ফেলে এসেছি তারাই আমার সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার সাথী।

বিদ্যুৎ-বিকাশের মত আমার স্মৃতিপথে তখন সেই সন্ন্যাসিনীর মুখখানি ভেসে উঠলো। মাতাজী! চমৎকার উপাধি। মনে মনে একটু হাসলুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার সেই আশ্রমটি একবার দেখবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হ'লো। মনে পড়লো, অচৈতন্য অবস্থায় সে একদিন আমাকে পথ থেকে

তুলে এনে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছিল, আর সে উপকারের বদলে আমি তাকে করেছি শুধু অপমান।

একটু অনুতাপও মনে এল বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করে জানলুম হরিদ্বার থেকে দেরাদূন খুব কাছে, ট্রেনে বোধ হয় আনা আষ্টেক ভাড়া। দিদির চুড়ি বিক্রী করার দরুণ তখন আমার কাছে যে টাকা ছিল তা যথেষ্ট। আর দেরী না করে বিছানা ও সুটকেশ বগলে করে তৎক্ষণাৎ রওনা হলুম ধর্ম্মশালা থেকে।

তখন আটটা বাজে। হরিদ্বার ষ্টেশনে গিয়ে শুনলুম আর পনেরো মিনিট পরেই একটা ট্রেন আছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে দেরাদূনে গিয়ে পৌঁছলুম। ষ্টেশনের বাইরে এসে অনেকগুলো চায়ের দোকান নজরে পড়লো। চায়ের দোকানের সঙ্গে আবার কোন কোনটায় হোটেলের ব্যবস্থাও আছে। তিন আনা পয়সা খরচ করে এক জায়গায় চারটি ভাত, রুটী ও ডাল খেলুম এবং তাদের সঙ্গেই ব্যবস্থা করলুম যতক্ষণ না ফিরে আসি আমার বিছানা ও সুটকেশটা রাখবার জন্যে। হোটেলের মালিককে মাতাজীর আশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি হিন্দুস্থানীতে বললেন, টপকেশ্বরের মন্দিরের কাছে।

সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে সিবিল লাইন পেরিয়ে দেখলুম সামনে একটা প্রকাণ্ড মাঠ তার ওপারে ঢেউ খেলানো পাহাড় পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে; আর মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পিচ্ দেওয়া কালো পথ—বহুদূরে। আর একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, টপকেশ্বরের মন্দিরটা সেই মাঠেরই ওপারে।

আধঘণ্টা লাগল মাঠটা পেরুতে। তারপর দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড

নদী, তাতে জলের একটা সরু ধারা বইছে—বড় বড় পাথরের চাঁই এখানে ওখানে ছড়ানো। নদীটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়। তারি মধ্যে বিরাট এক গহ্বর—সেইখানে থাকেন টপকেশ্বর মহাদেব। মৌচাকের মত একখানা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই ঝুলে আছে তাঁর মাথার ওপর—আর তাই থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ছে একটা ছোট পাথরের নুড়ির মাথায়, কোথা থেকে যে জল আসছে আজ পর্য্যন্ত তার কেউ সন্ধান পায় নি। আপনা-আপনি সেই বিরাটকায় পাথর চুঁয়ে জল পড়ে। এই দেবতার মাহাত্ম্য! সেই অন্ধকার গহ্বর হ'লো দেবতার মন্দিব, তার মধ্যে কয়েক জন জটা-জুটধারী সন্ন্যাসী ধূনি জ্বালিয়ে বসে আছে। তীর্থযাত্রীর প্রণামীর ওপর তারা জীবন ধারণ করে।

মাতাজীর মন্দিরের ঠিকানা একজনকে জিজ্ঞেস করে নিযে সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাবা! আলোয় এসে যেন প্রাণ বাঁচল!

কিছুদূর হাঁটবার পর দেখলুম, দু'টি পাহাড়ের মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, তার এক পাশ দিয়ে একটি নদীর সঙ্কীর্ণ ধারা বয়ে যাচ্ছে। নানা রকমের বন্য ফুল ফুটে আছে নদীর ধারে ধারে। তারি মধ্যে একটি ছোট্ট মন্দির আর আশে পাশে ছোট ছোট অসংখ্য চালা ঘর। দূর থেকে ঠিক ছবির মত দেখাচ্ছিল। ওইটেই মাতাজীর আশ্রম!

দু'তিনটি চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সেই উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছতেই আমার সঙ্গে দেখা হ'লো একটি পাঞ্জাবী যুবকের। ছিপছিপে একহারা চেহারা, বলিষ্ঠ ও গৌরবর্ণ। চোখদু'টি স্বপ্নালস, মাথায় চাঁপা রঙের পাগড়ী ও চাঁপা রঙের পোষাক পরা। নদীর ধার থেকে সে কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমায় বিদেশী দেখে যুবক থমকে

দাঁড়াল এবং নমস্কার করে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলে, আপনি কি মাতাজীকে দর্শন করতে যাচ্ছেন ?

প্রতিনমস্কার করে আমি বললুম, কেমন ক'রে জানলেন ?

সে বললে, এদিকে এই আশ্রম ছাড়া ত আর কিছু নেই। মধ্যে মধ্যে বিদেশী তীর্থযাত্রীরা আসেম মাতাজীকে প্রণাম করতে। তাই অনুমান করলুম আপনিও আমাদেরই আশ্রমে যাচ্ছেন।

আপনি এই আশ্রমে থাকেন নাকি ?

বিনীতকণ্ঠে যুবকটি উত্তর দিলে, আজ্ঞে হাঁ।

আমি বললুম, কিন্তু এই বয়সে আপনার ত বৈরাগ্য আসবার কথা নয়। বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে মানেন ত ?

সে বললে, খুব মানি। সেইজন্যেই ত আশ্রমবাসী হয়েছি।

তার মানে ?

তার মানে আপনি আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য কি তাই জানেন না।

একটু হেসে আমি বললুম, না জানিনা। কি উদ্দেশ্য বলুন ত ?

যুবকটি বললে, দেশের সেবা।

তার জন্যে ত কংগ্রেস আছে। সেখানে নাম লেখালে পারেন ?

দেশের সেবা বলতে আমরা বুঝি দেশের দুর্গত জনগণের সেবা—দরিদ্রকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ পথ্য দিয়ে পরিচর্য্যা করা, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। আগে গরীব লোকেদের বুঝতে দিন যে তাদের দেশবাসীরা তাদের জন্যে দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, তাদের জন্যে চিন্তা করেন, তবে ত তারা দেশের লোকের কথা শুনবে, তবে ত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল হবে !

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, কিন্তু এর জন্যে মাতাজীর কি প্রয়োজন ?

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে যুবকটি বললে, ওকথা মুখে আনবেন না। মায়ের কি প্রয়োজন সে কি আবার ছেলেকে বলে দিতে হবে ? সংসারকে যেমন মা তাঁর স্নেহস্পর্শে সঞ্জীবিত করে তোলেন, সংসারের বাইরেও তেমনি যে বৃহত্তর সংসার রয়েছে সেখানেও এই মায়ের প্রয়োজন। মাতাজীর মুখের কথায় আমরা কাজে প্রেরণা পাই, অন্তরে বল পাই—এ সমস্ত ত তাঁরই পরিকল্পনা।

গল্প করতে করতে আমরা ক্রমশই মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আমি বললুম, তাহলে ত আপনাদের মাতাজীর খরচা হয় খুব, কি বলুন ? তিনি এ টাকা পান কোথা থেকে ?

কেন ? তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে। এখানে তাঁর প্রায় দু'শো সন্তান আছে। এঁদের কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ উকিল, কেউ বড় ডাক্তার, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বা সঙ্গীতবিশারদ। সকলেই যার যা ছিল এনে মাতাজীর হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি প্রয়োজন মত খরচা করেন। সমস্তই এখন আশ্রমের সম্পত্তি। এই বলে যুবকটি এক একজনের নাম করে এক-একটি চালা ঘর দেখাতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, ভারতবর্ষের প্রায় সবজাতের লোকই সেখানে আছেন দেখলুম এবং অধিকাংশকেই বেশ প্রতিষ্ঠাবান ব'লে মনে হলো। শুনলুম জন-দুই সাহেবও আছেন। আমি বললুম, আপনাদের মাতাজীর সন্তানভাগ্য ত খুব ভাল। আচ্ছা, যে কেউ কি এই সন্তান হতে পারে, না কেবল বড়লোকদের জন্যে এই ব্যবস্থা ?

যুবকটি বললে, বড়লোক, গরীব লোক বলে এখানে কিছু নেই, এমন

কি জাতিভেদ পর্য্যন্ত নেই—তবে সমস্তটা নির্ভর করে মায়ের ওপর। সন্তান নির্ব্বাচন তাঁরই হাতে। তাছাড়া আমাদের অনেকগুলি ভগ্নিও আছেন মায়ের কাছে।

এমন সময় শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠলো মন্দিরের মধ্যে।

আমি বললুম, এইবার আপনাদের ভোগ শুরু হলো বুঝি?

যুবকটি বললে, না, আজ আমাদের মাতাজীর জন্মোৎসব—তাঁর পূজো শুরু হলো। তিনি যেদিন থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন আজ তার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হলো। আসুন তাড়াতাড়ি, এখুনি স্তব শুরু হবে।

এই ব'লে আমায় সঙ্গে করে সেই যুবকটি মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো।

মন্দির-প্রাঙ্গনে পা দিয়েই আমি চমকে উঠলুম। সন্ন্যাসিনী মন্দিরের মধ্যে একটা উচ্চ বেদীর ওপর বসে আছে। তার গলায় ফুলের মালা, পরণে লাল চওড়া পাড় সিল্কের গেরুয়া, কপালে চন্দনের টিপ; আল্‌তাপরা সুন্দর দু'টি পায়ের দু'ধারে দাঁড়িয়ে দু'টি তরুণ যুবক, চামর দিয়ে তাকে বাতাস করছে। রূপে রসে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসিনীর সেই মূর্ত্তিকে যে সেদিন কত সুন্দর দেখাচ্ছিল তা আমি বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। চারবছর আগে যে রূপ দেখেছিলুম এখন যেন তার চেয়ে চতুর্গুণ বেশী ব'লে আমার মনে হলো!

সন্তানের দলে প্রাঙ্গনটি পূর্ণ। তারা জোড়হস্তে একটা স্তব পাঠ করে মায়ের চরণে গিয়ে একে একে প্রণাম করতে লাগল। সকলের প্রণাম করা শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসিনী উঠে দাঁড়িয়ে সন্তানদের উদ্দেশ্যে এক আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলে। তারপর একটি জলপূর্ণ পাত্র হাতে করে একজন সন্তান মাতাজীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসিনী স্মিতহাস্যে তার বাঁ-পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি তাতে ডুবিয়ে

দিয়ে যেমন বসতে গেল অমনি আমার চোখের ওপর তার চোখ পড়ল।

নিমেষে সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে আবার যেন নিজেকে সামলে নিয়ে সে বসে পড়লো।

সন্তানরা ততক্ষণ মহা-উল্লাসে চরণামৃত বণ্টন করতে লেগে গেছে। মুখে, হাতে, গায়ে, মাথায় সেই চরণামৃত বারবার লেপন করেও যেন তাদের আশা মিটছিল না।

বুঝলুম, এ সৌভাগ্য এখনি আমার কাছেও এসে পৌছবে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকটির হাতে চরণামৃত দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে এলুম। তারপর যে পথে এসেছিলুম সেই পথ ধরেই ফিরতে লাগলুম।

কিছুদূর গিয়েছি এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে আমায় বললে, আপনাকে মাতাজী ডাকছেন ?

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, আমাকে ?

লোকটি দৃঢ়স্বরে বললে, হ্যাঁ আপনাকে।

একবার মনে করলুম, যাবো না, তারপর আবার কি ভেবে তার সঙ্গে ফিরে গেলুম।

লোকটি আমায় সঙ্গে করে এবারে আর মন্দিরে ঢুকলো না। পিছনের একটা দরজা দিয়ে একেবারে মাতাজীর খাস-কামরায় নিয়ে গেল।

ঘরটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। খাট বিছানা ও মূল্যবান আসবাবে ঠাসা। সামনে দেওয়ালের ওপর সন্ন্যাসিনীর একখানা

অয়েলপেণ্টিং করা ছবি। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন সেখানে কেউ ছিল না। কিন্তু লোকটি আমায় সেখানে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনী প্রবেশ করলো তার কল্পনাতীত রূপরাশি নিয়ে। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি টেনে এনে সে বললে, আপনি যে বড় চলে যাচ্ছেন?

রূঢ় জবাবই দিতুম হয়ত, কিন্তু কে জানে কেন খুব কঠিন কিছু বলতে পারলুম না। বললুম, আমরা গৃহী মানুষ, সন্ন্যাসী নইত, অতিরিক্ত ভণ্ডামী এখনও আমাদের ধাতে সয় না, কেমন যেন অসহ্য বোধ হয়!

সে কিন্তু লজ্জিত হ'লো না, বরং অপলক নেত্র আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বললে, গৃহী বলে আপনার রাগটা কিছু বেশী, মাথা ঠাণ্ডা থাকলে বুঝতে পারতেন যে এটা ভণ্ডামী নয়। মেনকাও সত্যি—মাতাজীও সত্যি!

বললুম, হয়ত তাই, কিন্তু আমার মন মানে না।

সে-কথার জবাব না দিয়ে পূর্ব্ব কথার জের টেনে সে বললে, মানুষের একটা পদস্থলনের ইতিহাসকেই কি আপনারা সত্যি করে রাখতে চান? তার পরের সমস্ত কৃচ্ছসাধন, সমস্ত তপস্যাই কি তার সেই এক মুহূর্ত্তের ইতিহাসের কাছে ম্লান হয়ে যাবে, তার কোন মূল্যই আপনারা দেবেন না? ...কে বলেছে আপনাকে যে সেদিনের ইতিহাস আজ মিথ্যা হয়ে যায়নি?

উত্তেজিত অবস্থায় সন্ন্যাসিনীকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি তার সেই আরক্ত মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম, জবাব দিতে পারলুম না।

সে একটু দম নিয়ে আবার বললে, এতগুলো লোক যারা আমাকে পূজো করছে তারা সবাই অন্ধ নয়, তারা ঠিকই দেখেছে। শুধু আপনিই টের পান্‌নি আমার পরিচয় কখন বদ্‌লে গেছে—মেনকা হয়েছে মাতাজী।

আমি বললুম, সবই মানছি কিন্তু মাতাজী, আমি পুরুষমানুষ, আব পুরুষ ব'লেই হয়ত পাটনার ব্রজেন বাগচী, মেনকার স্বামীকে আজও ভুলতে পারিনি। আচ্ছা মাতাজী, একটা কথা তোমাকে আগেও জিজ্ঞাসা করেছি, আজও করছি! জীবনে বহু নারী দেখলুম কিন্তু কি তারা চায়, কিসে তাদের আশা মেটে একথাটা আজও বুঝতে পারলুম না। বলতে পারো, তারা কি চায, কী তাদের কাম্য ?

একটু চুপ করে থেকে সে বললে, কোনদিন সহানুভূতির চোখে তাকে দেখেননি, তাই জবাব পাননি তবে শুনুন বলি, নারী ভালবাসে নিজেকে সকলের চেযে বেশী, তাই বহুর স্তুতি, বহুর পূজা না হ'লে তার তৃপ্তি হয না, বহু দর্পণে প্রতিফলিত না হ'লে যেমন সার্থক হয় না রূপ। সে ভালবাসা চায় অনেকের, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষেব পূজা চায সে।

আমি তার এই স্পষ্ট উত্তবে স্তম্ভিত হযে গিযেছিলুম। খানিকটা চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু যাবা ঘর সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সাবা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, স্বামীর ভালবাসাতেই যারা সুখী, তারা কি স্ত্রীলোক নয় ?

সন্ন্যাসিনী একটু হাসলে, বললে, পুকুরও জল, সমুদ্রও জল। কেউ পুকুরে স্নান করেই তৃপ্তি পায, কারুর বা সমুদ্রের প্রযোজন হয়। তেমনি স্ত্রীলোকও কেউ কেউ স্বামীপুত্রপরিজনের স্নেহ পূজা পেয়েই খুশী, সংসারের কর্ত্তৃত্বতেই তাদের সুখ , আবার কোন স্ত্রীলোকের জন্যে বৃহত্তব কর্ম্মক্ষেত্রের দরকার হয়, বিশ্বকে জয় করতে না পারলে তাদেব মন ভরে না—

আর কিছু শোনবার আমার প্রয়োজন ছিল না। আমি দ্বারের দিকে পা বাড়ালুম। কিন্তু মাতাজী আমার পথ রোধ ক'রে দাঁডাল। তারপব

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, কী, ক্ষমা মিললো ? না এখনও এ পাপিষ্ঠার ভণ্ডামীর কথা সাধারণে প্রচার করে তার মিথ্যা প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার বাসনা আছে ?

তার চোখের দিকে চেয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বললুম, না, সে ভয় নেই।

ভয় !

পথ ছেড়ে দিয়ে সে হেসে উঠল। বললে, তোমাকে আমার ভয় কোনদিনই নেই।

এই প্রথম সে আমায় তুমি বলে সম্বোধন করলে। আমি বললুম, কেন, আমি কি এতই অপদার্থ ?

না। কারণ তোমাকে আমি জয় করেছি। আজ নয়, বহুদিন আগেই—সেই চন্দ্রনাথে।

অকস্মাৎ আমি যেন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেলুম, তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললুম, তুমি জানতে এ কথা ?

সে হাত টেনে নিলে না। শুধু শান্ত কণ্ঠে বললে, জানতুম। তবে এ জানাকেও মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে। পরিচয় বদলাতে হবে তোমাকেও—। যাও তুমি, আর আমি আটকাবো না তোমাকে।

একটা হাত তুলে সে নমস্কারের ভঙ্গীতে কপালে ঠেকালে, তারপর দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমিও বাইরে বেরিয়ে এলুম।

আমার সামনে থেকে সেই পথ—সুদূর নিঃসঙ্গ পথ হাতছানি দিয়ে যেন আমাকে ডাকতে লাগল। কে জানে এ পথের শেষ হবে কবে !

শেষ